ডক্টর অম্লান দত্ত

প্রীতিভাজনেষু -

ভূমিকা

ছেলেবেলায় শুনতুম রাশিয়া বাদে সমগ্র ইউরোপ যত বৃহৎ একা ভারতবর্ষ তত বৃহৎ। ক্ষুদ্র ইংলণ্ড, সাত সমুদ্র পারে তার অবস্থান. সে কী করে এত বড়ো একটা মহাদেশ-তুল্য দেশের একচ্ছত্র মালিক হয়? জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে সে যদি আপনা হতে সরে যায় বা আমাদেরি কেউ যদি তাকে জোর করে সরিয়ে দেয় তা হলে তো আমরা নিজের ঘরে নিজে মালিক হই। নরমপন্থীদের আমরা কৃপার চক্ষে দেখি। ওঁদের ধারণা ইংরেজরা আছে বলেই ভারতবর্ষ অখণ্ড আছে, ওরা না থাকলে চৌচির হবে। ইউরোপেরই মতো। কিংবা মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর এই ভারতবর্ষেরই মতো। ব্রিটিশ সম্রাটই একমাত্র যোগসূত্র। তাঁর কাছে স্বাধিকার চাইতে পারো, স্বরাজ চাইতে পারো, কিন্তু দেশরক্ষার দায়িত্ব তাঁর উপরেই থাকবে, সুতরাং পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ভারও।

কিন্তু এমন এক সময় এল যখন পূর্ণ স্বাধীনতাই হলো কংগ্রেসের লক্ষ্য। এতে বহু বিজ্ঞজনের সায় ছিল না। রবীন্দ্রনাথেরও না। তিনি বলতেন, আগে তো ঐক্য গড়ে তোল। তার পরে ইংরেজদের বিদায় দেবার কথা তুলবে। আমরা ততদিনে যুবক হয়েছি। বৃদ্ধের বচন আমরা গ্রাহ্য করিনে। মুসলিম লীগ যখন পাকিস্তানের দাবী শোনায় তখন সেটাকেও আমরা অগ্রাহ্য করি। একবার ইংরেজকে হটাতে পারলে মুসলিম লীগকে হটাতে কতক্ষণ? কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল ইংরেজ আপনা থেকে হটে যাচ্ছে. সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষও দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেস যদি তাতে রাজী না হতো বহুভাগ হয়ে যেত। মাউন্টব্যাটেন হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি আপসের চেষ্টায় বিফল হলে প্রদেশওয়ারি ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেবেন। তা হলে কংগ্রেস অবশ্য আটটি প্রদেশকে নিয়ে ফেডারেশন গড়তে পারত, কিন্তু বাকী তিনটি প্রদেশ অন্যান্যদের কবলে পড়ত। বাংলাদেশের সবটা ছেড়ে না দিয়ে আধখানা হাতে রাখাই পণ্ডিতের কাজ। তেমনি পাঞ্জাবের আধখানাও। পূর্ণ স্বাধীনতার নবীন প্রস্তাবকারীদের একজন নিখোঁজ, আরেকজন ততদিনে প্রবীণ। অখণ্ড ভারতের জন্যে লড়বার ধৈর্য সে বয়সে নেই। পূর্ণ স্বাধীনতাই তিনি আদায় করলেন, কিন্তু বাংলার অখণ্ডতা, পাঞ্জাবের অখণ্ডতা, আসামের অখণ্ডতা ও ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারলেন না। কী করবেন, দেশের জনসংখ্যার একভাগ তাঁর বৈরী। তারা চায় দেশভিত্তিক রাষ্ট্র নয়, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র। না পেলে তারা ধর্মযুদ্ধ বাধিয়ে দেবে। সে ঝুঁকি অহিংসাবাদী যাঁরা তাঁরা নিতে পারেন না। এক

নোয়াখালী নিয়েই তাঁরা নাজেহাল। সারা দেশ জুড়ে শত শত নোয়াখালী হবে। তার উত্তর শত শত বিহার নয়। মহাত্মার একটাই তো শরীর। ক'টা জায়গায় তিনি যাবেন? একটাই তো জীবন। ক'বার তিনি অনশন করবেন? কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে একমত না হলেও তিনি তাঁদের সিদ্ধান্তের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবেন না। খর্বাকারে হলেও পাকিস্তানের পত্তন হলো। বাকী অংশটাকেই ভারত বলে অতীতের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করা গেল। অখণ্ডতা রক্ষা নয়, অন্বয় রক্ষা সেটাও কম কথা নয়। সেই বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে আছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র।

ওদিকে পাকিস্তান তাসের কেল্লার মতো ধ্বসে পড়ছে। কারণ সে অতীতের সঙ্গে অন্বয় ছেদ করেছে। তার যেটা শিকড় সেটা থেকে গেছে ভারতের মাটিতে। সুলতানদের দিল্লী, বাদশাহদের দিল্লী, বড়লাটদের দিল্লী ভারতেই। ভারতের মুসলমানদের পবিত্রতম তীর্থ আজমীর শরিফ, বাদশাহী আমলের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাজ-মহল ও লাল কেল্লা, একালের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠ আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আর হিন্দুস্থানী ভাষা ও সঙ্গীতের কেন্দ্র লখনউ ভারতের ভিতরেই। পাকিস্তানীরা ধর্মের জন্যে আরবদের দিকে তাকাতে পারে, কিন্তু গৌরবময় অতীতের জন্যে ভারতের দিকেই। অথবা মোহেন্‌জো-দরো ও হরপ্পার দিকে। সেসব ইসলামের ইতিহাসের সামিল নয়, ভারতের ইতিহাসের সামিল।

যে ভারতের সঙ্গে আজকের মানুষ পরিচিত সে ভারত বিভাগোত্তর স্বাধীন ভারত। তার বয়স হলো ছত্রিশ। তার গণতন্ত্রের বয়স হলো তেত্রিশ। তার জাতীয়তাবাদ বিগত শতাব্দীর। তার ধর্মনিরপেক্ষতা কিন্তু বহু বিতর্কিত বিষয়। আমাদের রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পিতারা বলেছেন এটা সেকুলার স্টেট। ইংরেজীতে সেকুলার কথাটির দুটো অর্থ। একটা অর্থ, যে মানুষ বা প্রতিষ্ঠান আদৌ কোনো ধর্ম মানে না। আর একটা অর্থ, যে মানুষ বা প্রতিষ্ঠান কোনো একটি ধর্মকে অগ্রাধিকার বা বিশেষ অধিকার বা অসমান অধিকার দেয় না। সে ধর্ম অধিকাংশের ধর্ম হলেও না। সংখ্যা এক্ষেত্রে গণনীয় নয়। হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর নিজেদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে পারে না। আইন সভায় তাদের দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা থাকলেও না। সৈন্যদলে তাদের আরো বেশী গরিষ্ঠতা থাকলেও না। ভোটের জোরেই হোক আর অস্ত্রের জোরেই হোক কেউ কখনো এই রাষ্ট্রকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারবে না। তেমন কাজ করতে গেলেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূলে কুঠারাঘাত করা হবে। আমরা আর ধর্মনিরপেক্ষ থাকব না।

আমাদের জাতীয়তাবাদ ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু ওই দ্বিতীয় অর্থে। এ দেশ বা রাষ্ট্র ধর্মবর্জিত নয়। তবে যারা ধর্ম মানে না তারাও নাগরিক হতে পারে ও নাগরিকের যাবতীয় অধিকার ভোগ করতে পারে। লোকে যদি তাদের গুণ দেখে তাদের ভোট দেয় ও গদীতে বসায় তবে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। আমাদের রাষ্ট্রই সর্বপ্রথম রাষ্ট্র যে রাষ্ট্র কমিউনিস্ট না হয়েও কমিউনিস্টদের ভোট দিয়ে গদীতে বসিয়েছে। অন্যান্য দেশে এর জন্যে কত রক্তপাত ঘটে গেছে। এদেশে তা ঘটেনি। তারাও লোকের ধর্মে আঘাত করেনি।

এটাই আমাদের সেকুলার স্টেটের বিশেষত্ব। কিন্তু ইদানীং অকালী শিখরা এটা ভুলে যাচ্ছে। তাদের মনোগত অভিপ্রায় শিখ রাষ্ট্র বা শিখ রাজ্য প্রতিষ্ঠা। যেখানে শিখদেরই অগ্রাধিকার বা বিশেষ অধিকার বা অসমান অধিকার। তাদের সব ক'টা দাবী যে অন্যায্য তা নয়, কিন্তু মূল দাবীটা অন্যায্য। বিরোধ মেটাতে গিয়ে যদি সংবিধান সংশোধন করি তো সেই নজীর পরে হিন্দু রাষ্ট্রবাদী দলবিশেষের ভোটবল জোগাবে। সৈন্যদলে যদি তাদের লোক থাকে তবে তাদের অস্ত্রবলেও বলীয়ান করবে। কাশ্মীরের মুসলমান ও বৌদ্ধ, সিকিমের বৌদ্ধ, অরুণাচলের অ্যানিমিস্ট ও বৌদ্ধ, নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয় ও মিজোরামের খ্রীস্টান, কেরলের মুসলমান ও খ্রীস্টান, পশ্চিমবঙ্গের ও ত্রিপুরার কমিউনিস্ট সকলেই বিদ্রোহের ধ্বজা তুলবে। এ বড়ো সাংঘাতিক নজীর। হিন্দু রাষ্ট্রবাদীরা ওৎ পেতে বসে আছে।

বিপদ কেবল পাঞ্জাবের শিখদের দিক থেকে নয়। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের অসমীয়া, নাগা, মণিপুরী ও মিজোদের দিক থেকেও। সবাই যে বিচ্ছিন্ন হতে চায় তা নয়, সবাই তো উগ্রপন্থী নয়। কিন্তু সকলের মনে ভয় যে তারা নিজ বাসভূমে পরবাসী হতে পারে। 'ভারতীয়রা' তাদের ভূমিতে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করবে। ক্রমে ক্রমে তাদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করবে। তাদের যার যার আইডেনটিটি থাকবে না। এই যে ভয় এটা পার্টিশনের পূর্বেও ছিল, কিন্তু পরে দিন দিন বেড়েছে। কারণ পূর্ববঙ্গে টিকতে না পেরে হিন্দুরা ঢুকছে শরণার্থী হয়ে, সঙ্গে করে জমি নিয়ে আসছে না, অসমীয়া প্রভৃতির জমিতে ভাগ বসাচ্ছে। চাকরিবাকরিতেও। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও এর বিরাম নেই। যারা সরাসরি ঢুকছে না তারা পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে ঢুকছে। খুব কম ক্ষেত্রেই তারা মূলধন নিয়ে আসছে ও সেই মূলধন খাটিয়ে নতুন বাসভূমির ধন বৃদ্ধি করছে। ওদিকে পাকিস্তানী বা বাংলাদেশী মুসলমান চাষীরাও আসছে নতুন জমিতে চাষ ও বাস করতে। একদা এরা স্বাগত ছিল। জলা জমি চর জমি পতিত জমি আবাদ করে মালিকের

উপকার করত। কিন্তু ইদানীং এরাও মালিক হয়ে বসছে. এদের হাতে চলে যাচ্ছে হাসিল হওয়া জমি। কাজেই এরা আর স্বাগত নয়। আগে এদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ছিল না। এখন এরাও ক্ষমতার রাজনীতিকে জড়িয়ে পড়ছে। তেমনি হিন্দু শরণার্থীরাও। সুতরাং এই দুই প্রকার বিদেশী আগন্তুকদের বাহিষ্কার না করলে অসমীয়া প্রভৃতির রাতে ঘুম নেই। তার যদি দেরি থাকে তবে আপাতত ভোট দেবার অধিকার কেড়ে নিতে হবে, তা হলে অর্ধেকটা ঘুম হবে।

এর সমাধানের বহু চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু একটা প্রবল অন্তরায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর চুক্তি। সেই চুক্তি অনুসারে ১৯৭১ সালের আগে যারা প্রবেশ করেছে তাদের বহিষ্কার করা চলবে না, তাদের ভোটদানের অধিকারও হরণ করা চলবে না। তারা ভারতের নাগরিক বলেই গণ্য হবে। বড়ো জোর এইপর্যন্ত হতে পারে যে তাদের আসাম প্রভৃতি রাজ্য থেকে সরিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে পুনর্বাসন করা হবে, যদি রাজ্য সরকারগণ সম্মত হন। তাঁরা অসম্মত হলে ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন দিল্লী, গোয়া, আন্দামান প্রভৃতি টেরিটরিতে চালান দিতে হবে। বলা বাহুল্য যাদের সরানো হবে তারা গোরু ছাগল ভেড়া নয়, তাদের দিকেও আইন আছে, তারা লড়তেও জানে। আসাম আন্দোলনের নেতারা কিন্তু জেদ ধরে বসে আছেন যে ১৯৫১ সালই ভিত্তি বর্ষ, ১৯৭১ সাল নয়। তাঁদের দিকেও যুক্তি আছে, দলিল আছে। তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন ও অবিরাম চালিয়ে যাবেনই। ইতিমধ্যে বহু লোকের প্রাণ গেছে, নারী ও শিশুরাও রেহাই পায়নি। বহু লোক নতুন করে শরণার্থী। রাজনৈতিক ক্ষমতা যাঁদের হাতে এসেছে আন্দোলনকারীরা তাঁদের নির্বাচনকে স্বীকারই করতে চান না। অথচ তাঁদের সরকারকে স্বীকার না করলে ভারত সরকারও আর আলাপ আলোচনা করবেন না। মোট কথা অসমীয়াদের গ্যারান্টি দিতে হবে যে কখনো তারা মাইনরিটিতে পরিণত হবে না।

আমার এই প্রবন্ধসংগ্রহে ভারতের বাইরের কয়েকটি দেশের প্রসঙ্গও আছে। আর আছে আরো কয়েকটি বিষয়েও লেখা। কোন্‌টি কোন্ সালে রচিত তা আমি টুকে রাখিনি, স্মৃতির আশ্রয় নিয়ে অন্যত্র উল্লেখ করছি। কিছু ভুলচুক থাকতে পারে। রচনাগুলির পৌর্বাপর্যও থাকেনি। স্থলে স্থলে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। বাদ সাদ দিলে প্রবন্ধগুলির ধারাভঙ্গ হতো।

প্রবন্ধ সূচী

স্বাধীনতা দিবসের প্রশ্ন

আর কয়েকদিন পরে আমাদের দেশের স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছর পূর্ণ হবে। দেশ বলতে আমি ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান এই তিন দেশকেই বুঝি। যদিও জানি যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে এসেছে।

আপাতত আমার ভাবনা চিন্তা ভারতকেই নিয়ে। ভারত যদি তার স্বাধীনতা হারায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তান তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে না, তারাও পরাধীন হবে। ভারত যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানও জড়িয়ে পড়বে। ভারত থেকে যদি গণতন্ত্র বিদায় নেয় তবে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানও গণতন্ত্র ফিরে পাবে না। সুতরাং ভারত যদিও একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা নয় তবু যে দু' ভাই পৃথক হয়ে গেছে তারাও ভারতের অনুবর্তী। আজ না হোক কাল।

এখন এই পঁয়ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতার ফলে আমার মনে নানা প্রশ্ন জেগেছে। প্রথম প্রশ্ন, ভারত কি চিরদিন তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে? আনুষ্ঠানিক-ভাবে স্বাধীন, কিন্তু পরোক্ষভাবে পরাধীন তেমন দেশ কি অন্যত্র দেখা যায় না। সামরিক তথা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বয়ংভর না হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতাও বিড়ম্বনা হতে পারে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, বিভিন্ন রাজ্যে যদি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি প্রবল হয় তবে কেবলমাত্র সামরিক শক্তি দিয়ে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখতে পারা যাবে কি? আসাম, মণিপুর ও মিজোরাম দিল্লী থেকে অনেক দূরে। যাতায়াতের পথ অতি সংকীর্ণ। ট্রাইবালদের সঙ্গে না রক্তগত মিল, না ধর্মগত মিল, না ভাষাগত মিল, না ঐতিহ্যগত মিল। ব্রিটিশ শাসনে কিছুকাল একসঙ্গে থাকার স্মৃতি তো দিন দিন মিলিয়ে যাচ্ছে। অরুণাচলের বেলা সে কথাও খাটে না। ইংরেজরা সে প্রদেশ শাসন করেনি। সেটা একটা প্রদেশই ছিল না। মানচিত্রে দেখানো হতো তিব্বতের অঙ্গরূপে। স্বাধীনতার বছর বারো আগে মানচিত্রে দেখানো শুরু হয়। সেটা কিন্তু চীন ও তিব্বতের দ্বারা অস্বীকৃত। এখনো বিতর্কিত ও আলোচনার বিষয়।

তৃতীয় প্রশ্ন, পার্লামেনটারি গণতন্ত্র কি চিরস্থায়ী হবে ? না তার জায়গা নেবে আমেরিকার মতো বা ফ্রান্সের মতো প্রেসিডেনশিয়াল গণতন্ত্র ? সেটাও যদি ধাতে না সয় তবে একপ্রকার ডিকটেটরশিপ ? সামরিক বা সমাজতান্ত্রিক বা ফাসিস্ট। না বিকেন্দ্রীকরণের পন্থা অবলম্বন করতে হবে। যার নাম পঞ্চায়তী গণতন্ত্র। যার প্রবক্তা মহাত্মা গান্ধী। পার্লামেনটারি গণতন্ত্রে একটা বিরোধী পক্ষ থাকে, পরে সেই বিরোধী পক্ষই হয় সরকার পক্ষ। আমেরিকার প্রেসিডেনশিয়াল গণতন্ত্রেও তাই। এদেশে তেমন একটা বিরোধীপক্ষ কোথায় যে পরে সরকার চালাতে পারে ? জনতা পার্টির মতো চৌচির হওয়া বিচিত্র নয়।

চতুর্থ প্রশ্ন, গণতন্ত্র কোনো মতে বজায় থাকলেও আইনের শাসন কি থাকবে ? আমরা যারা ব্রিটিশ আমলে আইনের শাসন দেখেছি ও তাতে অংশ নিয়েছি তারা মুখ বুজে আছি। যদি বলি, এটা আইনের শাসন থেকে বহুদূর সরে এসেছে তাহলে শুনতে হবে আপনারা দেশদ্রোহী বুর্জোয়া শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু আইনের শাসন যদি দুর্বল হয় তবে এ রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের দায়িত্বও পালন করতে পারবে না। গণতন্ত্রও হবে ফাঁপা বেলুন। যে-কোনোদিন ফেটে চুপসে যাবে।

পঞ্চম প্রশ্ন, অসভ্যতা ও অপসংস্কৃতি যদি দিন দিন প্রবল হয়, সভ্যতা ও সংস্কৃতি যদি দিন দিন দুর্বল হয়, তবে আমরা কী নিয়ে জগৎ সভায় দাঁড়াব ? কিসের গর্ব করব ? স্বাধীনতাই কি একমাত্র পুরুষার্থ ? বিদেশের লোক কি আমাদের অস্ত্র-সম্ভার ও যন্ত্রকৌশল দেখে শ্রদ্ধা করবে ? ভারতের আধ্যাত্মিকতা, ভারতের নৈতিকতা, ভারতের শ্রেয়োবোধ, ভারতের রুচিবোধ এসব কি অতীতের ব্যাপার হবে ? দালান তো উঠছে বিস্তর। সৌন্দর্যবোধ কোথায় ? এই নয়া ধনিক শ্রেণীর ঐশ্বর্য এখন আকাশছোঁয়া। কিন্তু কোথাও শোনা যায় না যে রকেফেলার ফাউণ্ডেশন বা ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের মতো জনহিতকর কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। একটি কি দুটি বাদে সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ই সরকার মুখাপেক্ষী। আমেরিকায় ঠিক বিপরীত। ললিতকলা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের জন্যে সে দেশের ধনিকরা মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করেন। যতদিন দেশীয় রাজারা ছিলেন তাঁরাও এদেশে তাই করতেন। এখন দেশীয় রাজারা নেই, পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নৃত্যগীতবিশরাদরা সস্তার পথ ধরেছেন। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করা মানে রাষ্ট্রের রুচি মেনে নেওয়া। অর্থাৎ রাজনীতিকদের ও আমলাদের।

ষষ্ঠ প্রশ্ন, দেশের লোক কি স্থির করে ফেলেছে যে তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে

এসে ভিড় করবে? তা যদি না পারে তবে গ্রামকেই শহর বানাবে? নগরগুলোও তো আজকাল বিদেশী ছাঁচের। এক্ষেত্রে ধনতন্ত্রে সমাজতন্ত্রে ভেদ নেই। ভারত যদি সমাজতন্ত্রী হয় তা হলেও নগরপ্রধান হবে। নগরপ্রভাবিত হবে। আর বিদেশী ছাঁচে ঢালাই হবে। এখন এই জলতরঙ্গ রোধ না করলে পরে আর পারা যাবে না। দিন দিন দেরি হয়ে যাচ্ছে। মনঃস্থির যদি করতে হয় তো আজ এখনি।

সপ্তম প্রশ্ন, দেশের লোক কি স্থির করে ফেলেছে যে মাটি খুঁড়ে যেখানে যা খনিজ আছে সব উদ্ধার করতে হবে, যেখানে যত গাছপালা আছে সব কেটে নিঃশেষ করতে হবে, যেখানে যত নদী আছে তাদের উপর পুল তৈরি করতে হবে, বাঁধ দিতে হবে? প্রকৃতির সঙ্গে শত্রুতা করলে প্রকৃতিও প্রতিশোধ নেবে। অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি আগেকার দিনেও ছিল। রাজশাহী জেলায় যখন রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলুম তখন বিরাট বিরাট দীঘি আমি দেখেছি। সেসব দীঘির এক পাড় থেকে আরেক পাড় দেখা যায় না। সেসব দীঘি ব্রিটিশ আমলের নয়, মোগল আমলের নয়, সুলতানী আমলের নয়, পাল সেন আমলের। সেকালের রাজারা অতিবৃষ্টির দিনে সেই সব দীঘিতে জল জমিয়ে রাখতেন। অনাবৃষ্টির দিনে সেখান থেকে জল সরবরাহ করতেন। সংরক্ষণের অভাবে সেসব দীঘি ক্রমশ অব্যবহার্য হয়ে গেছে। সেখানে এখন চাষ আবাদ হয়। সেগুলির সংস্কার করলে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি এই দুই সমস্যার সহজ সমাধান হতো। সেরকম দীঘি আরো খুঁড়তে পারা যেত। এ বিষয়েও মনঃস্থির করা জরুরি। পরে আর দীঘি খোঁড়ার জন্যে জমি পাওয়া যাবে না। যদি পাওয়া যায় তার দাম হবে আগুন। খননকারদের মজুরিও হবে দ্বিগুণ, তিন গুণ। যেখানে লবণ হ্রদ ছিল সেখানে এখন কলকাতার শহরতলি। পাল সেন যুগের দীঘিগুলোও এক এক করে উপনগর হতে পারে। মনে হবে দারুণ প্রগতি। কিন্তু অনাবৃষ্টিতে ও অতিবৃষ্টিতে মিলে যা ঘটাবে তা দারুণ দুর্গতি। স্বাধীনতার পর থেকে যেসব চটকদার পলিসি আমাদের নেতারা অনুসরণ করে এসেছেন তার স্বল্পমেয়াদী ফল আপাতমধুর। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী ফল বিষম তিক্ত। ফলভোগ যারা করবে সে বেচারিরা এখনো ভূমিষ্ঠ হয়নি। তাদের হয়ে অগ্রিম চিন্তা করছে কে? যদি-বা কেউ করছে তার কথা শুনছে কে?

স্বাধীনতা দিবসের স্মৃতি

রাত বারোটায় তন্দ্রা ছুটে যায়। খেয়াল ছিল না যে সেটা স্বাধীনতার লগ্ন। কানে আসে মুহুর্মুহু চিৎকার। ধরে নিই যে অন্যান্য রাত্রের মতো সেটাও হিন্দু মুসলমান দাঙ্গাবাজদের উপর গুলী চালনার সময় আর্তনাদ। এবার কিন্তু গুলীর আওয়াজ ছিল না। ওটা আর্তনাদও নয়, জয়ধ্বনি। তখন হুঁশ হয় যে আমার দেশবাসী এখন স্বাধীন। আমিও এখন স্বাধীন। এই দিনটি যে এ জীবনে দেখতে পাব তা সত্যি সত্যি বিশ্বাস হয়নি। তৃতীয়পক্ষ চলে যেতে চাইলেও হিন্দু মুসলমান কি তাদের চলে যেতে দেবে? এরা যদি প্রকৃতিস্থ হতো ওরা কবে চলে যেত।

তাহলে দুই শতাব্দীর রাজত্ব সত্যি সত্যি ছায়ার মতো সরে গেছে। আমার জীবন ধন্য যে আমি আজ বেঁচে আছি। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাষায়—

"Bliss it was in that dawn to be alive
And to be young was very Heaven."

ভোর হতে না হতে হাওড়া থেকে একদল মান্যগণ্য ভদ্রলোক এসে আমাকে ধরে নিয়ে যান হওড়া ময়দানে। সেখানে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করি। তারপর হাওড়া জজকোর্টের আমলারা আমাকে টেনে নিয়ে যান তাঁদের আদালতভবনে। যদিও অবিভক্ত বঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আমার হাওড়ার জজগিরি ফুরিয়ে গেছে। তখন আমি পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক ক্ষতিপূরণের কমিশনার। কলকাতায় নিযুক্ত। চার্জ নিইনি।

এসব অনুষ্ঠানের পর কলকাতা যাই নতুন বাসা দেখে আসতে। পথে যেতে যেতে লক্ষ করি লাটভবনের শীর্ষে উড়ছে নতুন গভর্নর রাজাজীর নিজস্ব পতাকা। চমক লাগে। তাহলে কি সত্যি সত্যি ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে দিয়ে গেছে ইংরেজ? প্রাণ ধরে পারল ও কাজ করতে? ইংরেজ ছাড়া আর কোন্ জাতি পেরেছে? ওদের বিদায় কেমন গ্রেসফুল! মনে মনে ওদের ধন্যবাদ দিই। দেখি

ময়দানে ইংরেজ মহিলা নির্ভয়ে গল্‌ফ খেলছেন। তাঁর মতো নির্ভয় আমরা কেউ নই। কারণ কালপর্যন্ত দাঙ্গার ভয় ছিল। আজকের দিন হিন্দুরা মুসলমানদের উপর চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেবে এ রকম একটা গুজব আমি সাত আটদিন আগে হাওড়ায় পৌঁছবার সময় থেকেই শুনে আসছিলুম। গান্ধীজী সেটার বিরুদ্ধে প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আজ তাঁর অনশন। হিন্দু মুসলমান শান্ত না হলে তিনি প্রাণত্যাগ করবেন।

ময়মনসিংহ থেকে প্রস্থান করার পূর্বেও আমি শুনে এসেছিলুম যে স্বাধীনতা দিবসে কলকাতায় যদি নতুন করে দাঙ্গা বাধে তবে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। তখন সেটা নোয়াখালীতে সীমাবদ্ধ থাকবে না। সুতরাং কলকাতায় দাঙ্গা বাধতে না দেওয়াই ছিল বিজ্ঞতা। তার জন্যে গান্ধীজী সুহরাবর্দী সাহেবের তথা ভাবী প্রধানমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সাহায্য নিয়েছিলেন। তখনকার দিনে মুখ্যমন্ত্রী কথাটি চালু হয়নি। হয় পরবর্তীকালে। স্বাধীনতা দিবস যে শান্তিতে কাটবে দিনের শেষ না দেখে বলবার জো ছিল না। দিনটি সম্প্রীতিপূর্ণ। সন্ধ্যাবেলা আমাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো হরিতকী বাগানে শ্রীঅতুল্য ঘোষের আস্তানায়। সেখানে জমায়েৎ ছিলেন বহু কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থক। উচ্চাসন থেকে ভাষণ দিতে হলো আমাকে। উঠোনে বসলেন আর সবাই। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন মন্ত্রীও। ত্যাগী সংগ্রামী। তাঁদের তুলনায় আমি কে? দেশের জন্যে কীই বা করেছি! সত্যাগ্রহীদের জেলেও পুরেছি। আবার তাঁদের সঙ্গে মেলামেশাও করেছি। গান্ধীজীর সঙ্গে ডক্টর ঘোষের গ্রামে গিয়ে সাক্ষাৎও করেছি।

মহাত্মাজী অনশন করেছেন। এটা তাঁর কাছে আনন্দের দিন নয়। আমার কাছেই বা হবে কী করে? আমি অখণ্ড ভারতের অফিসার থেকে নেমে এসেছি খণ্ডিত ভারতের অফিসার পর্যায়ে। অবিভক্ত বাংলার অফিসার থেকে পশ্চিম বাংলার অফিসার পর্যায়ে। এটা কি অবনমন নয়? এর গ্লানি কি আমি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিনে? বাংলা ভাষার সাহিত্যিক আমি, আমার পাঠকমণ্ডলী কি কেবল পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু? এটাও কি অবনমন নয়? মহাত্মার বেদনা তিনি আর সসাগরা ভারতের অধিনায়ক বা প্রতিভূ নন। তাঁরও অবনমন ঘটেছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এখন তাঁর কাছে বিদেশ। এই সেদিন যেখানে ছিল তাঁর শিষ্যদের মন্ত্রিত্ব। পূর্ববঙ্গ এখন তাঁর নাগালের বাইরে। নোয়াখালীতে তিনি তাঁর কাজ বাকী রেখে এসেছেন। তিনি রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হতে চাননি।

চেয়েছিলেন প্রধান সেবক হতে। আজ গোটা পাকিস্তান তাঁর কাছে পরদেশ। তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। এবার ইংরেজ রাজের দ্বারা নয়। লীগ রাজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা চলে না। অহিংস সংগ্রাম বাইরে বসে চালানো যায় না। একটি-মাত্র পন্থা তাঁর কাছে উন্মুক্ত। তিনি খণ্ডিত ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের অভয় দিয়ে এপারে সসম্মানে রাখবেন। তার সুফল ফলবে ওপারে। ওরাও সংখ্যালঘু হিন্দুদের অভয় দিয়ে সসম্মানে রক্ষা করবে। বা যদি ওরা না করে তবু তিনি প্রতিশোধের কথা ভাববেন না। প্রতিশোধ যারা নিতে চাইবে তাদের অনশন দিয়ে নিবৃত্ত করবেন। চাই কি প্রাণ বিসর্জন দেবেন। তাঁর নিজের প্রাণের মূল্য কী যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বিপন্ন!

সমুদ্রমন্থনের দিন অমৃতের সঙ্গে সঙ্গে গরলও উঠেছিল। তাকে কণ্ঠে ধারণ করে শিব হন নীলকণ্ঠ। এবার গান্ধীজীর কাজ সেই গরলকে কণ্ঠে ধারণ করে নীলকণ্ঠ হওয়া। সেইভাবে তিনি তাঁর দেশবাসীকে মহতী বিনষ্টি থেকে উদ্ধার করবেন। তাঁর এই কর্তব্য তাঁর একার নয়। তাঁর অনুগামীদের প্রত্যেকের কর্তব্য। আমি যদি অনুগামী হয়ে থাকি তবে আমারও। কেবলমাত্র চাকরি বজায় রাখা আমার পক্ষে গ্লানিকর। আমি চাকরি ছেড়ে দেবার জন্যে অনেকদিন থেকে তৈরি হচ্ছি। যে-কোনো দিন ছেড়ে দিতে পারি। গান্ধীজীও সেটা জানতেন। দেশের স্বাধীনতা সম্পন্ন হয়েছে। আমার স্বাধীনতা বাকী।

ইংরেজ অফিসারদের দশ বছর ধরে আটকে রাখা হয়েছিল, তিনবছর অন্তর ছুটি দেওয়া হয়নি। তাঁরা সবাই মিলে গণ ছুটি নিলে ব্রিটিশ রাজত্ব সামলাবে কারা? তারপর ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় তারা কাকে ছেড়ে কার উপর গুলী চালাবে? হিন্দুকে মারলে আবার সন্ত্রাসবাদীদের হাতে মরতে হবে। মুসলমানকে মারলে বাবুর্চি খানসামা চাপরাশি আর্দালি সবাই বয়কট করবে। সাহেবরা হাতে মরবে না, ভাতে মরবে। এরকম উভয় সঙ্কট তো মিউটিনির পর হয়নি। এর উপর যদি মিউটিনি ফের বাঁধে তবেই হয়েছে। "হিন্দু মুসলমান যদি লড়তে চায়, লড়ুক। আমরা কেন রিং ধরে থাকব?" বলেন বাংলার লাট বারোজ ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে ময়মনসিংহের সারকিট হাউসের ডিনার পার্টিতে জজকে আর তাঁর গৃহিণীকে। "আমরা যাচ্ছি" বলে তিনি আমাদের নোটিশ দেন। এর পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলীর নোটিশ। মহাপ্রস্থান পর্ব জুন ১৯৪৮ বা আরো আগে। আমরা তো আনন্দে অধীর। সিন্ধুবাদ নাবিকের ঘাড় থেকে নামবে দু'শো বছর

বয়সের বুড়ো। সেদিন আমরা ঘুঘু দেখেছি, ফাঁদ দেখেনি। সেই ফাঁদটা হচ্ছে পার্টিশন। আট মাস যেতে না যেতে কাঁদবার পালা। সে পালা এখনো শেষ হয়নি। যদিও কেটে গেছে চৌত্রিশ বছর। পাকিস্তানের পরমাণু বোমার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তার উত্তরও নাকি পরমাণু বোমা। সেটা ভারতের বা তার কশ্চিৎ বান্ধবের। গান্ধীজীর অপ্রতিশোধ নীতি এখন অগাধ সলিলে।

এখন তো আমি আর সরকারী চাকুরে নই। লেখা নিয়ে থাকি। লোকে বলে বুদ্ধিজীবী। জবাবদিহি চায়, আপনারা বুদ্ধিজীবীরা কী করছেন ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন ? অতি প্রাচীনকালে জনক রাজাকেও প্রশ্ন করা হয়েছিল, "মিথিলার রাজধানী জ্বলছে। আপনি করছেন কী ?" রাজর্ষি জনক একটি চমৎকার উক্তি করেছিলেন। সেটির উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন মাহাত্মা গান্ধী ! নোয়াখালী প্রসঙ্গে। উক্তিটি আমি বেবাক ভুলে গেছি। যদি কারো মনে থাকে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ হব। মর্মটা এই যে, নিবারণের জন্যে তো আমি যথাসাধ্য করেছি। নির্বাপণের জন্যেও যথাসাধ্য করছি। আজকের দিনের-বুদ্ধিজীবীরা এ ছাড়া আর কী বলতে পারেন ?

কলকাতায় মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা ছিল। সেটা সম্ভব হয়নি। তার আগে শান্তিনিকেতনে শেষ সাক্ষাৎ। সেদিন আমি তাঁর প্রার্থনা সভার ভাষণ শুনি। শ্রোতাদের তিনি উপদেশ দেন অস্পৃশ্যতা দূর করতে। জীবনের শেষদিনটির আগের দিনটি পর্যন্ত তিনি এই উপদেশ দিয়ে গেছেন। বেঁচে থাকলে শেষদিনটিতেও দিতেন। তার অনেক আগে তাঁর এক শিষ্যের মুখে শুনেছিলুম, তিনি বলেছিলেন, "দেশের লোকের কাছে আমার তিনটিমাত্র বক্তব্য আছে। খাদি, হিন্দু মুসলিম ঐক্য, হিন্দুসমাজ থেকে অস্পৃশ্যতালোপ। অস্পৃশ্যতা দূর না হলে পঁচিশ বছরের মধ্যেই হিন্দুসমাজ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।" কী সাংঘাতিক ভবিষ্যবাণী ! এতদিন পরে ফলতে শুরু করেছে। প্রথমে গান্ধীজীর নিজের গুজরাটেই। তার পরে রাজাজীর নিজের তামিলনাড়ুতেও। দেশভাগ, প্রদেশভাগের পর বাকী ছিল সমাজভাগ। সেবার তৃতীয়পক্ষের হাত ছিল। এবারেও তৃতীয়পক্ষের হাত আছে বলে আত্মসন্তোষ লাভ করা হচ্ছে। যেন বর্ণহিন্দুরা সবাই ধৌত তুলসীপত্র। এসব উটপাখীদের সঙ্গে তর্ক করা বুদ্ধিজীবীদের কর্ম নয়। গান্ধীবাদীদেরই এগিয়ে আসতে হবে, ব্রত নিতে হবে, 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'।

স্বাধীনতার সংগ্রাম কোনোদিনই সমাপ্ত হয় না। কোনো দেশেই হয় না। তাই

সৈন্যসামন্ত পোষণ করতে হয়, তাদের প্রতিদিন কুচকাওয়াজ করাতে হয়, অস্ত্রশিক্ষা দিতে হয়। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে দেশের আশাভরসার স্থল সৈন্যদল যুদ্ধে হেরে গেল। তা হলে কি দেশের লোক একপাল মেষের মতো আত্মসমর্পণ করবে? এর উত্তরে গান্ধীবাদীরা বলবেন, না। আরো একপ্রকার সংগ্রামপদ্ধতি আছে। তারও একটা দৈনন্দিন প্রস্তুতি আছে। অহিংস অস্ত্রশিক্ষা আছে। সৈন্যদল হেরে গেলেও জনগণ হার মানবে না। তারা সত্যাগ্রহ চালিয়ে যাবে। মরবে, তবু আত্মসমর্পণ করবে না। কখনো গণ সত্যাগ্রহ, কখনো ব্যক্তি সত্যাগ্রহ, কখনো শুধুমাত্র অসহযোগ, কিন্তু সব সময় একপ্রকার গঠনকর্ম। সেই গঠনকর্মই প্রাত্যহিক কুচকাওয়াজ বা প্রস্তুতি। গান্ধীজী তাঁর জীবনের শেষদিনটিতেও প্রতিদিনের মতো চরকা কেটেছেন। বেঁচে থাকলে নোয়াখালী ফিরে যেতেন, তার জন্যে জীবনের শেষদিনটিতেও বাংলা লিখতে শিখেছেন। দৈনন্দিন নিষ্কাম কর্মই কর্মযোগ। সেটা একপ্রকার ত্যাগস্বীকারও বটে। ভারতের সত্যাগ্রহীরাই তার সেকেণ্ড লাইন অভ ডিফেন্স। দ্বিতীয় দেশরক্ষাবাহিনী। এঁরা যদি আপৎকালে ছত্রভঙ্গ বা অদৃশ্য হন তবে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা পারে তা করবে, কিংবা ভুল নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধ হবে। প্রথম স্বাধীনতা দিবসে গান্ধীজী ছিলেন, আজকের স্বাধীনতা দিবসে মহাসত্যাগ্রহীর অভাব।

স্বাধীনতা দিবসের ভাবনা

এবারকার স্বাধীনতার দিবসে আমাদের মনে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ নেই। আনন্দ করতে হয়, তাই করব। সেটা একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে।

কিন্তু কেন এমন হলো? অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন। কতটুকুই বা আমি জানি? তবু উত্তর দিতে চেষ্টা করি। পূর্ণ নয়, আংশিক উত্তর।

দুশো বছরের দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত একটা সাম্রাজ্যকে উচ্ছেদ করার ক্ষমতা কোনো একটি সম্প্রদায়ের ছিল না। না হিন্দুর, না মুসলমানের, না শিখের। তেমনি কোনো একটি প্রদেশের ছিল না। না বাংলার, না পাঞ্জাবের, না আসামের। তেমনি কোনো একটি পার্টির ছিল না। না কংগ্রেসের, না মুসলিম লীগের, না কমিউনিস্ট পার্টির। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু কৃতিত্ব ছিল। কারো বেশী, কারো কম। ইংরেজদের নিজেদের কৃতিত্বও কিছু কম নয়। তারাও বুঝতে পেরেছিল যে যুদ্ধোত্তর জগতের ক্রমবর্ধমান সমস্যাগুলোর সঙ্গে মোকাবিলা করা বড়লাট ও তার মনোনীত পারিষদের কর্ম নয়। চাই নির্বাচিত মন্ত্রীদের প্রশস্তভিত্তিক সরকার, যে সরকার সাম্রাজ্যের আইনসম্মত উত্তরাধিকারী হয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করবে। আইনসম্মত বলতে বোঝায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইনসম্মত। সে পার্লামেন্ট আইন করে ভারতবর্ষের শাসনভার ভারতীয়দের হাতে হস্তান্তর করবে। তারা নিজেদের সংবিধান রচনা করে স্বয়ংশাসিত হবে। রেপাবলিকও স্থাপন করতে পারে। কিন্তু ব্রিটেনের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। এটা হলো আইনের বাইরে ভদ্রলোকের চুক্তি।

এ রকম চুক্তি কংগ্রেস ও লীগ উভয় দলের নেতাদের সঙ্গে হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন শিখ নেতাও। ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে সকলেই একমত ছিলেন। কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে দ্বিমত। কংগ্রেস চায় অখণ্ড ভারত। লীগ চায় দ্বিখণ্ড ভারত। শিখ নেতা না চাইলেও চরমপন্থী শিখরা চায় ত্রিখণ্ড ভারত। মুসলমানদের পাকিস্তান দিলে শিখদেরও খালিস্থান দিতে হবে। খালিস্থান

কথাটি স্বাধীনতার পূর্বেই শোনা গেছে। অন্য নাম শিখিস্থান। শেষপর্যন্ত সবাই মিলে স্থির করেন ভারত দ্বিখণ্ডই হবে, কিন্তু মুসলমানরা গোটা বাংলা ও গোটা পাঞ্জাব পাবে না। পশ্চিমবঙ্গ দিতে হবে হিন্দুদের আর পূর্ব পাঞ্জাব হিন্দু ও শিখদের একসঙ্গে। দুই উত্তরাধিকারী সরকার রেখে ইংরেজ সরকার বিদায় হয়। দুই ডোমিনিয়ম পরে দুই রেপাবলিক হয়। ভারতীয় ইউনিয়ন এখনও ব্রিটেনের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছে। পাকিস্তান সেটা ছিন্ন করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিলেতে গেলে পাকিস্তানী নাগরিকরা ভারতীয় নাগরিকদের সঙ্গে একই শ্রেণীভুক্ত হয়। কিন্তু তাঁদের কর্তাব্যক্তিরা কমনওয়েলথ কনফারেন্সে আসন পান না বলে আবার যোগসূত্র ফিরিয়ে আনতে চান।

এতদিন পরে শিখদের চেতনা হয়েছে যে তাদেরও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পাওয়া উচিত ছিল। ওরা ভুলে গেছে যে তৎকালীন পাঞ্জাবে এমন একটিও জেলা ছিল না যেখানে তারা সংখ্যাগুরু। তাই খালিস্থান হয়নি। প্রদেশভাগের পরে শিখরা প্রায় সবাই পূর্ব পাঞ্জাবে তথা ভারতের অন্যত্র চলে আসায় কয়েকটি জেলায় তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে। সুতরাং এখন আবার খালিস্থানের স্বপ্ন দেখছে। সংখ্যাধিক্যের জোরে ওরা পাঞ্জাবী সুবা দাবী করে ও পায়। এখন সুবার থেকে আরেক ধাপ উপরে উঠে শিখ রাষ্ট্র চায়। এবার পাঞ্জাবীভাষার ভিত্তিতে নয়, শিখ ধর্মের ভিত্তিতে। মুসলিম লীগের মুসলিম নেশনের মতো অকালী শিখদের শিখ নেশন। স্বতন্ত্র তথা সার্বভৌম। হিন্দুস্থান, পাকিস্তান ও খালিস্তান তিনটিই হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। হিন্দুস্থান যে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন হয়েছে ও হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীস্টান ইত্যাদির দেশভিত্তিক রাষ্ট্র হয়েছে, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র নয়, এটা তারা স্বীকারই করে না। পরিস্থিতিটা যেন ১৯৪৭ সালের মতোই আছে। মাঝখানের ছত্রিশ বছরে যেন কোনো পরিবর্তনই হয়নি।

কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে বইকি। ব্রিটিশ সরকারের মসনদে বসেছে ভারত সরকার, পাকিস্তান সরকার ও বাংলাদেশ সরকার। তিনটের মধ্যে একটা দেশভিত্তিক, একটা ধর্মভিত্তিক ও একটা ভাষাভিত্তিক। এরা হিন্দু, মুসলিম, শিখ নয়, ভারতীয়, পাকিস্তানী, বাঙালী। আজকের দিনে পৃথক একটি শিখ ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পেতে হলে ব্রিটেনের কাছে দরবার করা চলে না, ব্রিটেনের হাতে ক্ষমতা নেই। তাই ভারতের কাছেই চাওয়া হচ্ছে, যেন ভারতই একমাত্র উত্তরাধিকারী। যেন পাকিস্তানও শিখদের হোমল্যাণ্ড নয়। যেন মহারাজা রণজিৎ সিংহের রাজধানী

লাহোরে ছিল না। যেন অমৃতসরই ছিল শিখ রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু। যেন সন্তরাই ছিলেন শিখ সমাজের কুলপতি। যেন অকালীরাই সমুদায় শিখ সম্প্রদায়।

এই ছত্রিশ বছরে সব চেয়ে ভাগ্যবান যদি কেউ হয়ে থাকে সে শিখ সম্প্রদায়। তবু তাদের মনে দুঃখ হিন্দুদের আছে হিন্দুস্থান, মুসলমানদের আছে পাকিস্তান, শিখদের নেই শিখিস্থান বা খালিস্থান। রক্ত গরম হয়ে ওঠে যখন হিন্দুরা বলে, "শিখরাও হিন্দু।" এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতারা হিন্দু দেবদেবীদের, তাঁদের অবতারদের, তাঁদের মূর্তিগুলিকে, তাঁদের সম্পর্কিত শাস্ত্রগুলিকে বর্জন করে একটি আলাদা ধর্ম প্রচার করেছিলেন। সেটি হিন্দুও নয়, মুসলিমও নয়, উভয়ের সারাৎসার নিয়ে সৃষ্ট। শিখদের হিন্দু বললে মুসলিমও বলতে হয়। মুসলমানদের সঙ্গে তাদের মিলও কম নয়। কোরানের স্থান নিয়েছে গ্রন্থসাহেব, মসজিদের স্থান গুরুদ্বার। তাদের উপাসনা পদ্ধতি নিরাকারবাদীদের মতো, সাকারবাদীদের মতো নয়। তাদের বিবাহপদ্ধতিও হিন্দুদের মতো নয়। তবে হিন্দুদের সঙ্গে অজস্র মিল আছে। হিন্দু সমাজের সঙ্গে নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন হয়নি। কিন্তু ওদের ক্ষ্যাপালে ওরা তাই করবে। পাঞ্জাবের হিন্দু ও আর্যসমাজীরা যদি বলত, "হিন্দু শিখ ভাই ভাই" তাহলে ওরা ক্ষেপত না। তা হলে স্বতন্ত্র সত্তা মেনে নেওয়া হতো। তার বদলে যা বলছে তাতে স্বাতন্ত্র্য থাকে না। শিখরাও পরিণত হয়ে যায় শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবদের মতো হিন্দুদের একটি শাখায়। শিখদের মতে তা সত্য নয়। ইসলামের মতো, খ্রীস্টধর্মের মতো শিখধর্মও আলাদা একটি ধর্ম। ওরা মুসলমানকেও শিখ করে ও মুসলিম মেয়েকে শিখ করার পর বিয়ে করে। এই করতে গিয়েই গোঁড়া মুসলিমদের সঙ্গে ঝগড়া ও ঝগড়া থেকে মারামারি হানাহানি, দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতা। মুসলমানরা যদি ওটা মেনে নিত তা হলে হতো গলাগলি, কোলাকুলি, চিরস্থায়ী বন্ধুতা। কেউ কারো গোঁ ছাড়বে না। সুতরাং পাকিস্তানে বাস করা চলবে না। ভারতেই বাস করতে হবে ও সম্ভব হলে ভারতের কাছ থেকেই স্বতন্ত্র বাসভূমি আদায় করে নিতে হবে। চরমপন্থীদের মনের কথা, লড়কে লেঙ্গে খালিস্থান।

হিন্দু রাষ্ট্রবাদীদের সংখ্যা ও প্রভাব যতই বেড়ে যাচ্ছে দেশ ততই ভাঙনের অভিমুখে যাচ্ছে। পাঞ্জাবের শিখরা তো হিন্দু রাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যাবেই, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম ও মেঘালয়ের খ্রীস্টানরাও যাবে, অরুণাচলের ও সিকিমের বৌদ্ধরাও যাবে, কাশ্মীরে মুসলমানরাও যাবে। এসব ঘটনা ঘটবে কোনো এক দুর্বল

মুহূর্তে। তৃতীয় মহাযুদ্ধের ধাক্কায় বা বিপ্লবের ঘাত প্রতিঘাতে। হিন্দু রাষ্ট্রবাদীদের দাপটই আর সবাইকে তাড়াবে, যদি ইতিমধ্যে তাদের মতবাদকে দেশের লোক পরিহার না করে। ধর্মের স্থান মন্দিরে মসজিদে, গির্জায়। আফিসে, আদালতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, থানায়, ব্যারাকে নয়। সৈন্যদলের মধ্যে এ মতবাদ প্রবেশ করলে সর্বনাশ। আমাদের সৈন্যদল ধর্মনিরপেক্ষ। পাকিস্তানের মতো ধর্মাত্মক নয়। যুদ্ধকালে যারা অসমসাহসিক কাজ করে রাষ্ট্রীয় সম্মান পেয়েছে তাদের মধ্যে প্রথম স্থান কখনো মুসলমানের, কখনো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের, কখনো শিখের, কখনো পার্শীর। এরা ভারতসন্তান হিসাবে ভারতরাষ্ট্রের জন্যে লড়েছে, হিন্দু রাষ্ট্রের জন্যে নয়। এদের মনে বিভেদ ঢুকিয়ে দেওয়া দেশাত্মবোধের পরিচয় দেয় না, ধর্মাত্মবোধের পরিচয় দেয়। যদিও দেশাত্মবোধের ছদ্মবেশ ধারণ করে বালকদের ভোলায়। দেশের যুবশক্তি যেন এর দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়। ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ধর্মবর্জিত নয়। আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, গণ চীন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, পূর্ব জার্মানী এরা কেউ দুর্বল নয়। ব্রিটেনও কার্যত ধর্মনিরপেক্ষ।

ওদিকে অসমীয়ারাও বলতে আরম্ভ করেছে যে ওরাও একটি নেশন। তাই যদি হয় তবে ভারতীয় নেশনের সঙ্গে বেখাপ। এর লজিকসম্মত পরিণাম অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে বিচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্ন একটি রাষ্ট্র। বাংলাদেশ যেমন অবশিষ্ট পাকিস্তানের থেকে ভাষার ইস্যুতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে আসামও তেমনি ভাষার ইস্যুতে ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। বাংলাদেশই তার নজীর। বাংলাদেশ আজ যা ভাবে অবশিষ্ট ভারত কাল তা ভাবে। এটা তো আধুনিক ঋষিবাক্য। এ কি মিথ্যা হতে পারে? ভাষার ইস্যুতে কেবল আসাম কেন, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাডু, অন্ধ্রপ্রদেশও বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। আন্ধ্ররা আজকাল আর প্রদেশ নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। তাদের কাম্য তেলুগু দেশ। এক এক করে সবাই যদি বলে, "আমরা একটি নেশন, আমাদের চাই একটি হোমল্যাণ্ড" তা হলে ভারতীয় বলে যে নেশনটি আছে সেটি আর থাকবে না, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন বলে যে রাষ্ট্রটি আছে সেটিও বিশ পঁচিশ ভাগ হয়ে যাবে। মোগল সাম্রাজ্যেরও সেই দশা হয়েছিল। ইংরেজরা এসে ভাঙা টুকরোগুলিকে জুড়ে জুড়ে আবার এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। নইলে তার চেহারা হতো আফ্রিকার মতো। বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত। প্রত্যেকটি বিদেশী শাসিত বা প্রভাবিত।

আবার কি সেইরকম ভবিষ্যৎ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে? বলা যায় না।

দক্ষিণের রাজ্যগুলি জোট বাঁধছে। আপাতত তাদের লক্ষ্য কেন্দ্রের ক্ষমতা খর্ব করে রাজ্যের ক্ষমতাবৃদ্ধি। সেটা এমন কিছু অন্যায় দাবী নয়। সংবিধানে কেন্দ্রকে যে পরিমাণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কেন্দ্র তার চেয়ে বেশী ভোগ করছে। সর্বত্র কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হওয়ায় ও সকলে কেন্দ্রের বশংবদ হওয়ায় এইভাবে ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। এখন নানা রাজ্যে অ-কংগ্রেসী দল নির্বাচনে জিতে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করায় কয়েকটি রাজ্য ক্ষমতার পুনর্বণ্টন চায়। তা হলে ব্যালান্স পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। তবে অকালী দল খালিস্থানের পরিবর্তে যে পরিমাণ ক্ষমতা দাবী করছে সে পরিমাণ ক্ষমতা বর্তমান সংবিধান অনুসারে কোনো রাজ্যের প্রাপ্য নয়। তাতে ভারসাম্য নষ্ট হবে।

একটা গোঁজামিল বহুদিন থেকেই চলে আসছে। আমাদের ভারতরাষ্ট্র কি একটা ফেডারেশন না ফেডারেশন নয়? কখনো শুনি ফেডারেশন। কখনো শুনি তা নয়। কংগ্রেস যতদিন সর্বত্র মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করতে পারছিল ততদিন এর একটা হেস্তনেস্তর দরকার ছিল না। এখন দেখা যাচ্ছে একটি বাদে দক্ষিণের সব ক'টি রাজ্য কংগ্রেসের হাতছাড়া। কেরলও যে-কোনোদিন তাদের সঙ্গে জুটতে পারে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাও বার বার হস্তচ্যুত। গান্ধীজীর উপদেশ অনুসরণ করে বামপন্থীরা গ্রামে গ্রামে শক্ত ঘাঁটি নির্মাণ করেছে বা করছে। গ্রামের লোক যদি নিত্য ব্যবহার্য জিনিসগুলির জন্যে শহরের মুখাপেক্ষী না হয়, যদি তাদের তৈরি জিনিসগুলির জন্যে ন্যায্য দর পায়, যদি রাতারাতি ভূমিসংস্কার করতে গিয়ে শ্রেণীসংগ্রাম বাধিয়ে দেওয়া না হয় তবে পরবর্তী নির্বাচনে কী হবে তা আন্দাজ করা কঠিন নয়। বামপন্থীরা সংবিধানের বাইরে যাবার কথা বলছেন না। সংবিধান সংশোধন না করেও তাঁদের দাবী মেটানো যায়। কিন্তু তার আগে খুলে বলতে হবে এটা কি ফেডারেশন না ফেডারেশন নয়।

স্বাধীনতার পূর্বে সকলেই ধরে নিয়েছিলেন যে স্বরাজের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেশন আসবে। কিন্তু রাজন্যদের পিছু হটার ফলে মুসলিম লীগও পিছু হটে। কংগ্রেসেরও পলিসি বদলায়। ফেডারেশন হয় না, হয় দুই শক্তিশালী কেন্দ্র। তবু তার বেসিক স্ট্রাকচার বা মূল কাঠামোটা থাকে। কারো সাধ্য নেই যে সংবিধান সংশোধন করে সব ক'টি রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কেড়ে নিয়ে কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত করে। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে রাষ্ট্রপতির শাসন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে চলতে পারে। সেটা ব্যতিক্রম। সেটাই নিয়ম নয়। কিন্তু গান্ধীজী যেটা চেয়েছিলেন সেটা না হয়ে কংগ্রেস হাইকমাণ্ড যেটা চেয়েছিলেন সেটাই

হয়েছে। ক্ষমতা নিচের দিক থেকে উপরের দিকে ওঠেনি। উপরের দিক থেকেই নিচের দিকে নেমেছে। তাও কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের মনোনীত মন্ত্রীদের হাতে। কে কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, কে কে সাধারণ মন্ত্রী হবেন এসব তাঁরাই স্থির করে দেবেন। কে কে নির্বাচনের টিকিট পাবেন, কাকে কাকে লোকে ভোট দেবে, সেটাও তাঁদের নির্বন্ধ। জনগণ যেন নাবালক। ছত্রিশ বছর পরে তারা সাবালক হয়েছে। সংবিধান সংশোধন না করেও তাদের সঙ্গে সাবালকের মতো ব্যবহার করা যায়। কেন্দ্রকে দুর্বল না করেও রাজ্যকে সবল করা যায়। কেন্দ্রকে সর্বশক্তিমান না করেও শক্তিশালী করা সম্ভব।

ছত্রিশ বছর খুব একটা বেশী সময় নয়। এই ছত্রিশ বছর আমরা মোটের উপর সুস্থিত অবস্থায় রয়েছি। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জোটনিরপেক্ষতা এই তিনটি মূলনীতি সুদৃঢ় হয়েছে। যেটা নড়বড় করছে সেটা সমাজতন্ত্র। কী করে এটা মজবুত হবে সেটা ভাবনার বিষয়। আমাদের এই আপেল ফলের ঠেলাগাড়ীকে উলটে দিয়ে বিপ্লববাদীরা বিশেষ সুবিধা করতে পারবেন না। দেশটা সঙ্গে সঙ্গে চৌচির হয়ে যাবে। কংগ্রেস ভেঙে গেলেই যে বিরোধীপক্ষ তার শূন্যতা পূরণ করতে পারবে তাও নয়। বিরোধীপক্ষ বহুধা বিভক্ত। এমন দলও আছে যে ধর্মনিরপেক্ষ নয়। এমন দলও আছে যে জোটনিরপেক্ষ নয়। সত্যিকার একটা বিকল্প গড়ে তোলা দরকার। গড়ার কাজ না করে ভাঙার কাজ করলে ফেডারেশন তো হবেই না, ভগ্নপ্রায় দেশের সংহতি রক্ষার জন্যে কোনো এক মিলিটারি ডিকটেটরের আবির্ভাব হবে।

শিল্পবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধনবণ্টন না হলে কতক লোক লক্ষপতি কোটিপতি হয়, অধিকাংশ লোক দীনদরিদ্র থেকে যায়। অপরপক্ষে ধনবণ্টন যদি উৎপাদনশীল না হয় তবে কিছুদিন পরে বণ্টন করবার মতো ধন থাকে না। বণ্টনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া চাই। গ্রামে গ্রামে যদি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সেভাবেও শিল্পবিস্তার হতে পারে। যেমন করেই হোক দেশের সব ক'টি সমর্থ ব্যক্তিকে উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত রাখা দরকার। এটা শুধু আর্থিক কারণেই নয়, নৈতিক কারণেও বটে। বেকার বসে থেকে পরের অর্জিত অন্ন ধ্বংস করা ব্যক্তি বা সমাজ কারো পক্ষে হিতকর নয়। কেউ বেকার বসে আছে দেখলে তাকে কাজে লাগিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু ইংলণ্ড, আমেরিকার মতো শিল্পসমৃদ্ধ দেশেও সেটা সম্ভব হচ্ছে না। হঠাৎ একটা বিপ্লব ঘটলেও যে সেটা সম্ভব হবে তা নয়।

মূল কারণটা নিহিত রয়েছে মানুষকে দিয়ে কাজ না করিয়ে যন্ত্রকে দিয়ে কাজ করানোয়। আমার ছেলের এক বন্ধু বিলেতে সরকারী চাকরী করে। মাঝে মাঝে দেশে এসে বাপমায়ের সঙ্গে দেখা করে যায়। তার কাছে শুনি বিলেতে এখন কম্পিউটারের সাহায্যে কাজ করানোর ধূম পড়েছে। ফলে প্রত্যেক বছর কিছু না কিছু লোক ছাঁটাই হচ্ছে। সরকারী চাকরি থেকেও। তারা বেকার হবে, বেকার ভাতা পাবে। তাতে তাদের কুলিয়েও যাবে। কিন্তু বসে বসে রাষ্ট্রের অন্ন ধ্বংস করার গ্লানি যাবে কোথায়? জীবনের সার্থকতা কি যুবক বয়সেই নিষ্কর্মা হয়ে অনর্জিত অন্ন ভোগ করা! জাতির পতন তো অমনি করেই হয়।

প্রাণী জগতে কেউ অলস নয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রত্যেকটি পশুপাখী কর্মব্যস্ত থাকে। কোনো কোনো প্রাণী নিশাচর। তারাও রাতে কাজ করে। সমাজকেও প্রকৃতির সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হবে। যে সমাজ সবাইকে কাজ দেয় সেই সমাজই প্রগতিশীল সমাজ। সমাজের মান উন্নত না হলেও সে উন্নতিশীল। চার দিকে দারিদ্র্য দেখে আমি ততটা বিচলিত নই, যতটা কর্মহীনতা ও কর্মবিমুখতা দেখে। দীর্ঘকাল ধরে ধর্মঘট যারা করে তারা কি বুঝতে পারে না যে তারা কাজের শক্তি হারিয়ে ফেলছে? যেটা হারিয়ে গেল সেটা আরো মূল্যবান। একজন সেতার বাদক যদি প্রতিদিন রেওয়াজ না করেন তাঁর বাজাবার হাত চলে যায়। এর কি কোনো ক্ষতিপূরণ আছে।

যে কারণেই হোক স্বাধীন ভারত সবাইকে সুখী করতে পারেনি, সন্তুষ্ট করতে পারেনি। নেতাদের দোষ আছে, ধনিকদেরও দোষ আছে। কিন্তু দোষের তালিকা করতে বসলে কাকেই বা বাদ দেওয়া যায়? আজকের দিনে আমি গুণগুলোই ধরব, দোষগুলো নয়। সদ্য স্বাধীন হয়ে আর ক'টা দেশই বা ভারতের মতো অসংখ্য সমস্যার মোকাবিলা করেছে? তাও গণতান্ত্রিক উপায়ে। ভারতের ইতিহাসে আর কখনো পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মরাঠা, দ্রাবিড়, উৎকলীয়, বাঙালী, পশ্চিমা একসঙ্গে গভর্নমেন্ট চালাননি, তাও একজন মহিলার নেতৃত্বে। সিভিল সার্ভিস গুলোতেও মহিলারা স্থান পেয়েছেন। সৈন্যদলে অসামরিক জাতির পুরুষরাও প্রবেশ পেয়েছেন। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্‌রা কারো চেয়ে খাটো নন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতে সম্মানিত আসন। আমরা যেন আমাদের ঘরোয়া সমস্যাগুলোকে বাড়িয়ে না দেখি। সব চেয়ে বড়ো কথা আমরা সামরিক জোটবন্দী হইনি, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকব

স্বাধীনতার মূল্য চিরজাগর

সর্বজনের অনুমোদিত একটি মূলতত্ত্ব হলো যে কোনো রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় শাসন-কার্য হবে তিনটি ভাগে বিভক্ত : এক, কার্যনির্বাহক বিভাগ, দুই, ন্যায়বিচারক বিভাগ. তিন, বিধানপ্রণয়নকারী বিভাগ। ভারতে যুগ যুগ ধরে প্রথমটি আছে। দ্বিতীয়টিও যে ছিল না তা নয়, কিন্তু এখনকার মতো জেলা আদালত, তার উপরে হাইকোর্ট. তার উপরে সুপ্রীম কোর্ট ছিল না। এটা এদেশে বিবর্তনসূত্রে আসেনি, এসেছে প্রবর্তনসূত্রে। ব্রিটিশ আমলেই এসব প্রবর্তিত হয়। তফাৎ শুধু এইটুকু যে ফেডারল কোর্ট পরিণত হয় সুপ্রীম কোর্টে। স্বাধীনতার পরে যেটা কোনো কালেই ছিল না সেটা হচ্ছে বিধান প্রণয়ণনকারী বিভাগ। ব্রিটিশ আমলেই এর গোড়াপত্তন হয়। জনসাধারণ ভোট দিয়ে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রাদেশিক তথা কেন্দ্রীয় আইনসভায় পাঠায়। তাঁরাই সেখানে গিয়ে আইন পাশ করার অধিকারী হন। স্বাধীনতার পরে তাঁরাই ভারতের সংবিধান করেন ও তাঁদের রচিত সংবিধান অনুসারে তিনটি বিভাগই নিয়ন্ত্রিত হয়। অনেক ভেবেচিন্তে তাঁরা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তার নাম পার্লামেনটারি গণতন্ত্র। অর্থাৎ পার্লামেন্টের কাছেই কার্যনির্বাহক বিভাগের জবাবদিহির দায়। কিন্তু ন্যায়বিচার বিভাগের জবাবদিহির দায় কার্যনির্বাহক বিভাগের বা বিধানপ্রণয়নকারী বিভাগের কাছে নয়। সে দায় ঈশ্বর মানলে ঈশ্বরের কাছে, বিবেক মানলে বিবেকের কাছে। জনমতের কাছে। ভাবী-কালের কাছে। বিশ্ববাসীর কাছে। আমাদের সংবিধানে এমন কোনো কথা নেই যে পদাধিকারীদের সবাইকে ঈশ্বর মানতে হবে। এটা ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান। বিবেকের সঙ্গে বোঝাপড়ারও কোনো অনুশাসন নেই। তবে সর্বসাধারণ প্রত্যাশা করে যে ন্যায়বিচারের ভার যাঁর উপরে ন্যস্ত হয়েছে তিনি বিবেকের সঙ্গে বোঝাপড়া করেই তাঁর কাজ করবেন।

ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে একচ্ছত্র রাজচক্রবর্তীরা ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁরা ভারতকে বেশীদিন ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারেন নি। ভারত বরাবরই বহু রাজ্যে

বিভক্ত। স্বাধীন হয়ে এবার আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে রাজ্যের সংখ্যা যত বেশী হোক না কেন তাদের উপরে একটি ছত্র থাকবে, সেটি হবে কেন্দ্রীয় শাসন। প্রত্যেকটি রাজ্যের মতো তারও থাকবে তিনটি শাখা। সকলের মাথার উপরে থাকবেন একজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি। তিনি সম্রাট না হলেও সম্রাটস্থানীয়। ব্রিটেনের ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সরল। সেখানে মাত্র একটি গভর্নমেন্ট, একটি জুডিসিয়ারি, একটি পার্লামেন্ট। আমাদের এদেশে উপরের দিকে একপ্রস্থ, নিচের দিকে এক এক রাজ্যে এক একপ্রস্ত। এদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা স্বৈরতান্ত্রিক আমলে সহজ, গণতান্ত্রিক আমলে কঠিন। সেইজন্যে সংবিধানে ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের ক্ষমতা সুদূরপ্রসারী হলেও রাজ্যের ক্ষমতাও বড়ো কম নয়। আরো বেশী ক্ষমতার কথা গান্ধীজী বলেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস নেতারা তাতে রাজী হননি। তাঁদের আশঙ্কা ছিল যে আরো বেশী ক্ষমতা পেলে রাজ্যগুলি এক এক করে বেরিয়ে যাবে, কেন্দ্র তখন কানা হয়ে যাবে। সে আশঙ্কা অমূলক নয়। ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবী উত্তাল হয়ে তৎকালীন মাদ্রাজ বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশ তথা রাজ্যকে ভেঙে তিন চার টুকরো করে। পরে অবশ্য পুনর্বিন্যাস হয়। আরো পরে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রগঠনও সম্ভবপর।

কেন্দ্র বনাম রাজ্য এই বিতর্ক এতদিন জোরালো হয়নি তার কারণ একটিমাত্র পার্টিই সর্বত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে শাসনকার্য নির্বাহ করছিল, আইন প্রণয়ন করছিল, বিচারপতি নিয়োগ করছিল। ইতিমধ্যে খাস কেন্দ্রেই কংগ্রেসকে হটিয়ে জনতা পার্টি তার জায়গায় বসেছে। আর রাজ্যগুলিতেও কংগ্রেসের একাধিপত্য দূর করেছে কোথাও বামপন্থী জোট, কোথাও দক্ষিণপন্থী জোট, কোথাও হযবরল। কেউ জোর করে বলতে পারে না কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সম্পর্ক কতদিন সুমধুর থাকবে। কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের ঝগড়া মেটাবার জন্যে কোনো মধ্যস্থ আমাদের সংবিধানে নেই। কেন্দ্র ইচ্ছা করলে বিদ্রোহী রাজ্যের উপর রাষ্ট্রপতির শাসন চাপিয়ে দিতে পারে, কিন্তু সেটা নির্দিষ্ট কালের জন্যে। তার পরে কী উপায়? অর্ধেক রাজ্য একজোট হয়ে আরো বেশী ক্ষমতা দাবী করলে সবাইকে তো আর দমন করা যাবে না। সংবিধান সংশোধন করতে হবে। আর নয়তো আমাদের প্রতিবেশী পাকিস্তানের অনুসরণ করতে হবে। সেখানে গণতন্ত্রই নেই, তাই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণও নেই। গান্ধীজীর কাছে বিকেন্দ্রীকরণই ছিল আদর্শ। গান্ধীপন্থীরা সেই ভাবাতেই কথা বলেন। কিন্তু ছত্রভঙ্গের শঙ্কায় আমি তটস্থ।

ভয়কে জয় করার গণতান্ত্রিক মন্ত্র আমার অজানা। আসামের দিকে চেয়ে দেখুন, তারপরে বিকেন্দ্রীকরণের নাম জপ করুন। তা বলে আমি অতিকেন্দ্রীকরণের দিকেও ঝুঁকব না। ক্ষুরধার পন্থা। একটু এদিক ওদিক হলে সর্বনাশ। গণতন্ত্রী হলেও ভারত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নয়। সেখানেও একবার চারবছর ধরে গৃহযুদ্ধ ঘটেছিল।

আমেরিকার অনুকরণে একদল প্রেসিডেনশিয়াল ডেমোক্রাসীর ফরমাস দিচ্ছেন। সেটা পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর চেয়ে ঢের বেশী জটিল। সেদেশে দুটি পার্টিই পালা করে শাসন করে। এখানে দুটি পার্টির বদলে দশটি পার্টি প্রত্যেকটি নির্বাচন কেন্দ্রে প্রার্থী দেয়, তাদের মধ্যে একটিই জেতে, সেটি সাধারণত কংগ্রেস। জনমত যেদিন দুটি পার্টিকে রেখে আর সব ক'টিকে খারিজ করবে সেদিন দেখবেন সেই দুটি পার্টি পালা করে ভোটে জিতবে ও পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীকেই জিতিয়ে দেবে। আমাদের স্বভাবটাই হলো বারো রাজপুত তেরো হাঁড়ির। এর সংশোধন না হলে প্রেসিডেনশিয়াল ডেমোক্রাসীও কি ধোপে টিকবে?

কেন্দ্র বনাম রাজ্য, পার্লামেণ্টারি বনাম প্রেসিডেনশিয়াল, এ দুটো বিতর্কের পর আরও একটা বিতর্ক বেশ জবর। সেটা একজিকিউটিভ বনাম জুডিসিয়াল। বিচারপতিরা গায়ে পড়ে পার্লামেণ্টের গায়ে হাত দেন না। লোকে তাঁদের দ্বারস্থ হলে তাঁরা সংবিধানের ধারাগুলি পরীক্ষা করে যে রায় দেন তা হয়তো পার্লামেণ্টের বিপক্ষে যায়। সে রায় কি সংবিধানবিরুদ্ধ? তাই যদি হতো তবে রাতারাতি সংবিধান সংশোধন করার প্রয়োজন থাকত না। আমেরিকায় ওঁরা কথায় কথায় সংবিধান সংশোধন করেন না। এক বিচারপতি অবসর নিলে তাঁর শূন্য স্থানে নিজের পছন্দসই বিচারপতি নিয়োগ করেন। আমাদের মহামান্য মন্ত্রীরা বিচারপতি সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে পছন্দসই বিচারপতি নিয়োগ করলে কেউ বলবে না যে কাজটা বেআইনী। বিচারপতির সংখ্যা বাড়ানোর পক্ষে জোরালো যুক্তি আছে। আদালতগুলোতে মামলা জমতে জমতে আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। তবে সংখ্যা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বেতনও বাড়াতে হবে। নয়তো যোগ্যতমের সম্মতি মিলবে না।

সবচেয়ে ধারালো বিতর্ক ব্যক্তিস্বাধীনতা নিয়ে। এটা যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়ে থাকে তবে এর কাঠামোটা অটুট রেখেই সমাজতন্ত্রের প্রাণসঞ্চার করতে হবে। গণতন্ত্রকে মেরে সমাজতন্ত্রকে বাঁচানো কি শুধুমাত্র সংবিধান সংশোধন দিয়ে সম্ভব?

তার জন্যে নির্জলা ডিকটেটরশিপ ও তার আনুষঙ্গিক রক্তপাত আবশ্যক হবে। তার মানে কেবল বিরোধী পার্টিগুলোকেই উৎখাত করা নয়, বিরোধী শ্রেণীগুলোকেও উচ্ছেদ করা। এটা হলো বিপ্লবের পন্থা। বিবর্তনের পন্থা নয়। এ পন্থা যাঁরা বরণ করবেন তাঁদের জন্যে পার্লামেন্টারি বা প্রেসিডেনশিয়াল কোনো প্রকার গণতন্ত্রই নয়। তাঁরা কেন তবে নির্বাচন লড়বেন, আইনসভা জুড়বেন, মন্ত্রী পরিষদ্ গড়বেন? এর যদি সত্যি কোনো দাম থাকে তবে ব্যক্তিস্বাধীনতারও দাম আছে। ব্যক্তি যদি স্বাধীনভাবে ভোট না দিতে পারে তো ভোটাধিকারই বা কেন এত দামী হবে। আর ভোটাধিকার যদি দামী হয়ে থাকে তবে ভোটারের ব্যক্তিস্বাধীনতাও সেই অনুপাতে দামী। ভোটার স্বাধীনভাবে চিন্তা করবে, বিবেচনা করবে, ওজন করবে, তারপরে যাকে তার পছন্দ তাকে ভোট দেবে।

ভোটাররা যাতে চোখ কান খোলা রেখে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে তার জন্যে যাঁরা জনমত গঠন করতে সাহায্য করেন তাঁদেরও ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকা চাই। তাঁদেরও চাই চিন্তার স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা, সভাসমিতিতে মত প্রকাশ করবার স্বাধীনতা, সংবাদপত্রে তথ্য প্রকাশের স্বাধীনতা, শাসকদের সমালোচনার স্বাধীনতা, আইনসঙ্গত অপোজিশনের স্বাধীনতা। এসব স্বাধীনতা খর্ব করলে বা হরণ করলে গণতন্ত্রকেও খর্ব করা বা হরণ করা হয়। গণতন্ত্রে বিশ্বাস থাকলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করা যায়, তথ্য অপ্রমাণ করা যায়। তার জন্যে নিরস্ত্র লেখককে জেলে পুরতে হয় না। তাও বিনা বিচারে। হতেও পারে যে তাঁর লেখনীটাই একটা ধারালো অস্ত্র। একবার আমাকেও বলা হয়েছিল যে আমার লেখা যদি প্রকাশ করতে দেওয়া হয় তার ফলাফল সুদূরপ্রসারী হবে। বাংলাদেশে থেকে এককোটি হিন্দু চলে আসবে। আমাদের কর্তারা মরে যাবেন। অতএব আগে থেকেই সেনসরশিপ শ্রেয়। একেই বলে লেখনী হচ্ছে তরবারির চেয়ে শক্তিমান। তবে এটা ব্যাজ ভক্তিও হতে পারে। কোনো সংবাদপত্রে বা সাহিত্যপত্রে আমার সে লেখা প্রকাশিত হতে পারে না। পরে আমি সেটা বই করে বার করে দিই। সেটা ইতিহাসের আদালতে নথিভুক্ত হয়ে রইল।

আমরা যারা নির্দলীয় বুদ্ধিজীবী তারা নাগরিকহিসাবে ট্যাক্স দিই। নির্বাচনকালে ভোট দিই। আমাদের মতামত ব্যক্ত করা অপরের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে এটা যদি কেউ আমাদের বুঝিয়ে দেয় তা হলে আমরা নিজেরাই নীরব থাকব। কিন্তু সাধারণত যা দেখি তা হচ্ছে যিনি যখন কর্তা তখন তাঁর মন জুগিয়ে

লেখা বা কথা বলা এটা যাঁদের স্বভাব নয় তাঁরা নীরব থেকে গা বাঁচান। একভাবে না হোক আরেকভাবে গা বাঁচানোই যদি এত বড়ো একটা দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত মনের স্বভাব হয় তবে তো এদেশ কোনোদিনই জগতের শ্রদ্ধা পাবে না। গণতন্ত্র থাকলেও যদি চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতা না থাকে তবে একরাশ" জোহুকুমই হবে সে দেশের প্রতিনিধি। বাইরের লোক যদি তাদের দেখেই ভারতের বিচার করে তবে ভারতের মুখ আলো হবে না। আঁধার হবে।

সিভিল লিবার্টির ইস্যুতে গান্ধীজী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেছিলেন, স্বরাজের ইস্যুতে নয়। সেটা ছিল স্বরাজের মতো দরকারী, স্বরাজের জন্যেই দরকারী। স্বরাজ তো অর্জন করাই যথেষ্ট নয়। তাকে সুরক্ষিত করাও দরকার। তার জন্যেও চাই সিভিল লিবার্টি। নাগরিকরা সকলেই এর ধারক ও বাহক। তাঁরা যদি সংগঠিত হন তবেই তাঁরা আত্মরক্ষা করতে পারবেন।

কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক

ভারতের চেয়েও বিরাট দেশ চীন। সেদেশে কিন্তু একটির বেশী সরকার নেই। সেটি তার কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় কথাটি সেক্ষেত্রে বাহুল্য। কিন্তু ভারতের বেলা তা নয়। এদেশে আরো একপ্রস্থ সরকার আছেন। তাঁদের বলা হয় রাজ্য সরকার। চূড়ান্ত ক্ষমতা যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তবু রাজ্য সরকারগুলিও একেবারে ক্ষমতাহীন নন। তাঁরাও সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রের সঙ্গে ক্ষমতার শরিক। সংবিধানে কতকগুলি ক্ষমতা কেন্দ্রের জন্যে সংরক্ষিত, কতকগুলি রাজ্যসকলের জন্যে, কতকগুলি কনকারেণ্ট অর্থাৎ দুই পক্ষের এক্তারে। সংঘর্ষ যদি কখনো বাধে তো এই কনকারেণ্ট বিষয়গুলি নিয়ে বাধতে পারে। তা নইলে রাজ্য সরকার কখনো সৈন্যদল গঠনের অধিকার দাবী করেন না, ডাকঘর বসাতেও চান না, নোট ছাপানোর দাবীও তাঁদের মুখে শোনা যায় না, আয়করের অংশ চাইলেও আলাদা করে আয়কর ধার্য করতে যান না। অপর পক্ষে, কেন্দ্রীয় সরকারও কখনো জেলার প্রশাসন হাতে নেন না, পুলিশের কাজে হস্তক্ষেপ করেন না, ভূমিরাজস্ব আত্মসাৎ করেন না বা রদ করেন না, মদের দোকান খোলেন না বা বন্ধ করেন না। আমাদের প্রধানমন্ত্রী যদি ভারতের সর্বত্র সুরাপান নিষিদ্ধ করতে চান তো তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীদের সবাইকে রাজী করাতে হবে। নয়তো এক রাজ্যে কারণবারির অনাবৃষ্টি, অপর রাজ্যে অতিবৃষ্টি। যেসব রাজ্যে গোহত্যা নিষিদ্ধ হয়েছে সেসব রাজ্যের গোরু নাকি পশ্চিমবঙ্গে চালান হয়ে আসে ও এ রাজ্যের কসাইখানায় জবাই হয়। সম্প্রতি এই নিয়ে আন্দোলন চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি কেন্দ্রের সঙ্গে একমত না হন তবে কেন্দ্রকেই পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে একমত হতে হবে। এমনি একরাশ উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি-যে কেন্দ্র সর্বশক্তিমান নন, রাজ্য সর্বশক্তিহীন নন। সংবিধান উভয়ের প্রতি ন্যায়বিচার করতে চেয়েছিল, অবিচার যদি কেউ করে থাকেন তো তিনি আমাদের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী, যিনি তাঁর দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এমারজেন্সীর সুযোগ

নিয়ে সংবিধানকে ইচ্ছামতো সংশোধন করেছেন। রাজ্য সরকারের অনিচ্ছাসত্ত্বে কেন্দ্র যখন খুশি পুলিশ পাঠাতে পারেন, তাঁদের পুলিশ তাঁদের কাছেই দায়ী থাকবে, রাজ্য সরকার সাক্ষীগোপাল। হাইকোর্টকেও তাঁরা বহু পরিমাণে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করেছেন। শিক্ষাকেও তাঁরা কনকারেন্ট বিষয় করেছেন। সংশোধিত সংবিধানকে আবার সংশোধন করতে হবে। নয়তো রাজ্যের দিক থেকে ক্ষোভের হেতু থাকবে।

চীনদেশে একটিমাত্র দল ক্ষমতাসীন। এদেশের সংবিধানে তেমন কোনো কথা নেই। এদেশে একাধিক দলের হাতে একাধিক রাজ্যের শাসনক্ষমতা থাকতে পারে। এখনি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কেন্দ্রে জনতা সরকার, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার। আমাদের প্রত্যেকের দুটি করে ভোট। একটি ভোট কেন্দ্রের লোক-সভার জন্যে, অপরটি রাজ্যের বিধানসভার জন্যে। আমরা যদি মনে করি যে কেন্দ্রের হাতে আরো বেশী ক্ষমতা থাকা উচিত তাহলে আমরা সেই দলটিকেই ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিতে চাইব যে দল আরো বেশী ক্ষমতা হাতে পেলে আমাদের আরো বেশী উপকার করবে। আর আমরা যদি মনে করি যে রাজ্যের হাতেই আরো বেশী ক্ষমতা থাকলে আরো ভালো হয় তবে আমরা সে দলটিকে ভোট না দিয়ে অন্য একটি দলকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিতে চাইব। এ দল চেষ্টা করবে রাজ্যকে আরো ক্ষমতাসম্পন্ন করতে। আমাদেরকেই ভেবে স্থির করতে হবে কোন্ অবস্থায় কোন্‌টা শ্রেয়। অতিকেন্দ্রীয়করণ না বিকেন্দ্রীকরণ। দুই দিকেই জোরালো যুক্তি আছে। জবরদস্ত কেন্দ্র না হলে ভারত আবার ভেঙে যেতে পারে। আবার পরাধীন হতে পারে। অতীতে এরকম বার বার হয়েছে। সেটা কি কাম্য? কখনোই নয়। অপর পক্ষে, রাজ্যগুলি যদি শক্ত সমর্থ, আত্মনির্ভর ও উদ্যোগবান না হয় তবে এই বিরাট দেশের বুনিয়াদ চিরকাল কাঁচা থেকেই যাবে। চূড়া যতই উচ্চ হোক না কেন তাকে ধারণ করে থাকে সুগভীর ভিত্তি। সুদৃঢ় ভিত্তি।

ক্ষমতার বণ্টন এমনভাবে করতে হবে যাতে কেন্দ্রও প্রয়োজনের সময় যথেষ্ট ক্ষমতা হাতে পায়, রাজ্যও ক্ষমতার অভাবে হাত গুটিয়ে বসে না থাকে। কোনো পক্ষ যেন অপরপক্ষের উপর দোষারোপ না করে। যতদিন একই দল এখানেও ছিল ওখানেও ছিল ততদিন দোষারোপের অবকাশ ছিল না। কিন্তু ইতিমধ্যে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। যতদূর দৃষ্টি যায় প্রতিবার না হলেও বার বার এরকম হবে। লোকে মুখ বদলাতে চাইবে। এতে একটা প্রতিযোগিতার ভাবও আসবে। একই

দল বরাবর জয়ী হলে অহঙ্কারে আত্মহারা হয়। ভুলে যায় যে মালিক সে নয়, মালিক হচ্ছে সাধারণ নাগরিক, যার হাতে ভোট। ভোটাররা এতদিনে সেয়ানা হয়ে গেছে। তাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা আর সহজ নয়। তা হলেও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। জার্মানরা কি কম সেয়ানা ছিল? তা হলে হিটলারকে সর্বেসর্বা হতে দিল কী করে? কাউকেই খুব বেশী বাড়তে দিতে নেই। ঝড়ে পড়ে যাবে। ঝড়টা গৃহযুদ্ধও হতে পারে, আন্তর্জাতিক যুদ্ধও হতে পারে। অথচ কাউকে দুর্বল বা অসহায় হতে দেওয়াও সমীচীন নয়। সরকার মানেই বলিষ্ঠ সরকার। যে সরকার ভয়ে জড়সড় সে সরকারকে আমি সরকারই বলিনে। রাজ্য সরকারদের যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সে ক্ষমতা ব্যবহার করা না করা তাঁদের ইচ্ছাধীন। হয়তো তাঁদের কারো কারো ইচ্ছাই নেই। নিজের অনিচ্ছাকে তাঁরা পরের উপর আরোপ করে পাশ কাটাতে চান। এতে তাঁদের গদী বাঁচতে পারে, কিন্তু কাজ এগোয় না। কখনো বা কেন্দ্রীয় সরকারও নিজের অনিচ্ছাকে ঢাকতে পারেন রাজ্য সরকারের উপর দোষারোপ করে। মাঝখান থেকে গণতন্ত্রের বদনাম হয়। লোকে গণতন্ত্রের বদলে একনায়কত্বের গুণগান করে। অমনি করে হিটলারের জন্যে পথ পরিষ্কার হয়।

যারা গণতন্ত্র রাখতেই চায় তারাও বলে প্রেসিডেনশিয়াল ডেমোক্রাসী পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর চেয়ে ভালো। সাধারণ লোকের মুখে একথা হয়তো মানায়, কিন্তু যাঁরা তুলনা করে দেখেছেন ও দেশের মাটির সঙ্গে যোগ রেখেছেন তাঁদের জানা উচিত যে শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ ও বিধায়কবিভাগের মধ্যে সমভাবে ক্ষমতা ভাগ করে না দিলে রাষ্ট্রপতিই হবেন সর্বেসর্বা। যেমন হয়েছেন আমাদের দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রে। এই বিরাট দেশে যদি সেরকম অতিকেন্দ্রীকরণ ঘটে তবে আমেরিকার মতো চেক ও ব্যালান্স থাকবে না। তার সুযোগ নেবে দেশের মিলিটারি। যেমন নিয়েছে বাংলাদেশে ও পাকিস্তানে। পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর ছিদ্র অনেক। সেইসব ছিদ্র দিয়ে দুর্নীতি প্রবেশ করলে সেই বেনোজল দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু বেনোজল কি প্রেসিডেনশিয়াল ডেমোক্রাসীকে প্রবেশের ছিদ্র পায় না? গত শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকার অবস্থা কি আজকের ভারতের চেয়ে কম দুর্নীতিপূর্ণ ছিল? এক এক করে প্রত্যেকটি ছিদ্র বন্ধ করতে হয়েছে ও হচ্ছে ও হবে। এর কোনো শর্ট কাট নেই। কোনোপ্রকার গণতন্ত্রেই না। ডিকটেটর-শাসিত দেশে হয়তো দুর্নীতি নেই। কিন্তু ওটাই কি জীবনের একমাত্র বা সর্বপ্রধান অভিশাপ? যারা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে না, সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, কথা

বলতে পারে না, কাজ করতে পারে না, গুপ্ত পুলিশের ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে, বিনা বিচারে আটক থাকে বা বেগার খাটে, সুস্থ হয়েও মানসিক রোগের জন্যে নজরবন্দী হয়, এক জেলা থেকে আরেক জেলায় যেতে হলে পাশপোর্ট বা পারমিট নিয়ে যায়, সব সময় আইডেনটিটি কার্ড নিয়ে ঘোরে, পালাতে গেলে গুলী খেয়ে মরে তাদের জীবন দুর্নীতিমুক্ত হতে পারে, সন্ত্রাসমুক্ত নয়। জীবনকে সর্বতোভাবে মুক্ত করতে হবে। তবেই না আমরা মানুষ।

আমাদের যেটা আছে সেটাই মোটের উপর ভালো। সেটাকেই আরো ভালো করতে হবে। কোনো রাষ্ট্রেরই সংবিধান সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নয়। কিছু না কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে যায়ই। সেইজন্যে বার বার সংশোধনের প্রয়োজন হয়। তবে প্রত্যেকটি সংবিধানের একটা মূল কাঠামো বা বেসিক স্ট্রাকচার থাকে। আমাদের সংবিধানেরও আছে। এটা যাঁরা অস্বীকার করেছেন তাঁরা নির্বাচনে হেরে গেছেন। কিন্তু সেই পরাজয় থেকে তাঁরা যে কিছু শিখেছেন তা বলা শক্ত। আমাদের এ রাষ্ট্রের গঠন দোতালা বাড়ীর। এর নিচের তলায় অনেকগুলি ঘর। সেগুলির নাম রাজ্য। উপরতলায় একখানিমাত্র ঘর। সেটিকে বলা হয় কেন্দ্র। নিচের ঘর সংখ্যা পরে বাড়তে পারে, কিন্তু উপরে ওই একখানা ঘরই থাকবে। কিন্তু ঘরের সংখ্যা উপরতলায় একখানা হলেও সেইঘরের আসবাবসংখ্যা বাড়তেও পারে, কমতেও পারে। আমরা ইচ্ছা করলে কেন্দ্রকে আরো বেশী শক্তিশালী করতে পারি সেটা রাজ্যগুলোর খরচে। অথবা আমরা কেন্দ্রের বিষয়সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে রাজ্য গুলির বিষয় সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু যেটাই করি না কেন সকলের মত নিতে হবে। লোকসভার দুই-তৃতীয়াংশ ভোট, তার উপরে রাজ্যসভার দুই-তৃতীয়াংশ ভোট, তার উপরে অর্ধেকসংখ্যক রাজ্যের সমর্থনও মূল কাঠামোর এত বড়ো ওলটপালটের পক্ষে যথেষ্ট নয়। পার্লামেন্টের সোভরেনটি আমাদের সংবিধানে স্বীকৃত হয়নি। সোভরেনটি ভারতের জনগণেরই। এত বড়ো একটা মৌল পরিবর্তনের জন্যে রেফারেণ্ডাম বা গণভোট অত্যাবশ্যক। সেটা যদি অবাস্তব মনে হয় তো আবার সংবিধান সভা ডাকা যেতে পারে। কেন ডাকা হচ্ছে সেকথা ভোটদাতাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। তাঁরা তাঁদের প্রতিনিধিদের সেই অনুসারে ম্যাণ্ডেট দেবেন। বিবেচনার জন্যে বছরখানেক সময় দিতে হবে। গতবারের সংবিধান সংশোধনের মতো এমারজেন্সী ঘোষণা করে রাতারাতি কেল্লা ফতে করলে চলবে না।

রাজনৈতিক সংবিধানকে অর্থনৈতিক সংবিধানে পরিণত করাও একপ্রকার মৌল পরিবর্তন। এ রাষ্ট্র যদি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয় তবে রাষ্ট্রই হবে যাবতীয় জায়গাজমি কলকারখানা দোকানবাজার ধনসম্পত্তির মালিক। প্রাইভেট বলে যদি কিছু থাকে তবে সেটা রাষ্ট্রের অনুগ্রহে, রাষ্ট্রের তার সীমানির্দেশ করবে। এখন পর্যন্ত কোথাও এত বড়ো একটা ওলটপালট পার্লামেন্টের ভোটে বা সংবিধান সভার ভোটে বা রেফারেণ্ডামের ভোটে সাধিত হয়নি। এদেশে যদি হয় তো সেটা হবে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। হবে না যে, তাই বা কেমন করে বলি? হবে যে, তাই বা কেন নয়? সব কিছু নির্ভর করছে জনগণের উপরে। তাদের মতৈক্যের উপরে।

সেকাল আর একাল

সেকালের রীতি ছিল এই। সেক্রেটারি অভ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া ছিলেন সবার উপরে। তিনি যে আদেশ দিতেন ভারতের বড়লাট তা মান্য করতেন। বড়লাট যে আদেশ দিতেন প্রাদেশিক লাট তা মান্য করতেন। প্রাদেশিক লাট যে আদেশ দিতেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তা মান্য করতেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যে আদেশ দিতেন অধীনস্থ কর্মচারীরা তা মান্য করতেন। সেক্রেটারি অভ স্টেট থেকে গ্রাম্য চৌকিদার পর্যন্ত প্রসারিত ছিল একটি লোহার শিকল। প্রশাসনকে সে শিকল মজবুতভাবে বেঁধেছিল। শিকলটা ছিল আইনেরও শিকল। আদেশ যাঁরা দিতেন তাঁরা আইনের মর্যাদা রক্ষা করতেন। নয়তো ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে ছিল তাঁদের জবাবদিহির দায়। ওয়ারেন হেস্টিংসকে একদা ইমপীচ করা হয়েছিল। মাঝে মাঝে দেখা যেত বড়লাট অসময়ে ইস্তফা দিয়ে বিদায় নিয়েছেন। লাটসাহেবরা যে অকালে ইস্তফা দিতেন তারও দৃষ্টান্ত আছে।

একালে আমরা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন নই। আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণ লাভ করেছি। আমাদের তৈরি সংবিধানই আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রে গঠিত হয়েছে লোকসভা ও রাজ্যসভা, রাজ্যে রাজ্যে বিধান-সভা। কোনো কোনো রাজ্যে বিধান পরিষদ্‌ও আছে। লোকসভা ও বিধানসভা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত। রাজ্যসভা ও বিধান পরিষদ্ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত। সেক্রেটারি অভ স্টেট তথা বড়লাটের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই চলেন। ক্ষেত্রবিশেষে তিনি স্বয়ংচালিত। কিন্তু সেরূপ পরিস্থিতি কদাচিৎ দেখা দেয়। তেমনি, রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শেই চলেন। কিন্তু সেরূপ পরিস্থিতি ততদিন দেখা দেয়নি যতদিন প্রত্যেকটি রাজ্য তথা কেন্দ্র ছিল কংগ্রেসের শাসনাধীন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর মতভেদ ঘটলে প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি আদেশ দিতে পারতেন না, দিলে সেটা হতো সংবিধানবিরুদ্ধ। কিন্তু কংগ্রেস হাই কমাণ্ড তো উভয়েরই পেছনে। হাই কমাণ্ডের

হাতেই নির্বাচনকালে টিকিট বিতরণের ও প্রচারকার্যের ভার। বৈতরণী পারাপারের কাণ্ডারী যাঁরা তাঁদের শরণ নিয়ে কখনো প্রধানমন্ত্রী জয়ী হতেন মুখ্যমন্ত্রীর উপর, কখনো মুখ্যমন্ত্রী অপরাজিত থাকতেন। একটি দৃষ্টান্ত আমার মনে আছে। পশ্চিমবঙ্গের অশান্ত অবাস্থায় বিচলিত হয়ে নেহরু বলেন এখনি সাধারণ নির্বাচন চাই। বিধানচন্দ্র বলেন, চাইনে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বিধানচন্দ্রের পক্ষে নেন।

কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে কেন্দ্র যে-দলের দ্বারা শাসিত রাজ্যবিশেষ সেই দলের দ্বারা শাসিত নয়। কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী অমান্য করলে সংবিধানে শাস্তির বিধান নেই। কংগ্রেস হাই কমাণ্ডও নিরুপায়। এরূপ স্থলে যেটা অগতির গতি সেটা হচ্ছে রাজ্যপালকে দিয়ে রিপোর্ট লিখিয়ে নেওয়া যে, রাজ্য রসাতলে যাচ্ছে, কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ অপরিহার্য, রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতিকেই নিতে হবে শাসনের ভার। বলা বাহুল্য রাষ্ট্রপতি এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শে চালিত। কেন্দ্রীয় সরকার পার্লামেন্টের কাছে দায়ী। রাজ্যের বিধানসভা বাতিল কিংবা শিকেয় তোলা।

কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে রাজ্যের জনমত রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপের বিরোধী। তা হলে জনমতের চাপে অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন ঘটাতে হবে। সাধারণ নির্বাচনে যদি কেন্দ্রীয় শাসকদলের হার হয় ও রাজ্যের শাসকদলের জিৎ হয় তবে প্রধানমন্ত্রীকেই নাকাল হতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বনাম মুখ্যমন্ত্রী এই দ্বন্দ্বে আখেরে কে যে জয়ী হবেন তা নির্বাচকরাই জানেন। নির্বাচকদের মনে কী আছে তা জানাবার জন্যে বিদেশে গ্যালপ পোল অনুষ্ঠিত হয়। এদেশে তেমন কিছু হয় না। গ্যালপ পোলের রেওয়াজ থাকলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সময়ে সতর্ক হতেন। গতবারের সাধারণ নির্বাচনে সদলবলে পরাজিত হতেন না। কিংবা পরাজিত হলেও অমন পাইকারিভাবে নয়।

কংগ্রেসের একাধিপত্যের যুগ আর নেই। কংগ্রেস নিজেই এখন বহুধা বিভক্ত। কেন্দ্রে তার স্থান নিয়েছিল জনতা দল। কিন্তু সম্প্রতি জনতা দলেও ভাঙন ধরেছে। রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। অসম্ভবও সম্ভব হয়। তবু দেখে শুনে মনে হয় ইংলণ্ডের মতো দুই প্রধান দল পর্যায়ক্রমে দেশ শাসন করবে এটা অবাস্তব ধারণা। একই কথা খাটে রাজ্যের বেলাও। যতদূর দৃষ্টি যায় কোয়ালিশনই হচ্ছে কেন্দ্রের তথা রাজ্যের ভবিতব্য। কোয়ালিশন যে সব সময় মন্দ তা নয়। কোয়ালিশন যে সংবিধানবিরোধী তাও নয়। পশ্চিম জার্মানী বহুকাল ধরে কোয়ালিশনের দ্বারা

শাসিত। তা সত্ত্বেও সমৃদ্ধ ও সুশৃঙ্খল। কোয়ালিশন যদি ভারতের তথা বিভিন্ন রাজ্যের ললাটলিখন হয়ে থাকে তবে 'হায় হায়' করা অকারণ।

কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেকে ভাবতে আরম্ভ করেছেন যে ওটা পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসী নয়। ওর চেয়ে ভালো প্রেসিডেনশিয়াল ডেমোক্রাসী। কেউ কেউ তো ডেমোক্রাসী জিনিসটার উপরেই হতাশ হয়ে ডিকটেটরশিপের ফরমাস দিচ্ছেন। বিশেষ করে মিলিটারি ডিকটেটরশিপের। অপরাধ হয়তো দু' তিনশো জন রাজনীতিক করেছেন। তাঁদের অপরাধে সাজা পাবে কিনা কোটি কোটি নাগরিক বা নির্বাচক। কেন, তারা কি তাদের ভোটের অপব্যবহার করেছে? তারা কি উপযুক্ত পাত্রকে ভোট দেয়নি? পাত্ররা যদি দলবদল করেন তবে পাত্ররাই তার জন্যে দায়ী। তাদেরকেই বলা হোক জনসভায় দাঁড়িয়ে জনসাধারণের সামনে জবাবদিহি করতে। দলবদলের বিরুদ্ধে আইন পাশ হয়নি। কাজটা বেআইনী নয়। কিন্তু বেআইনী না হলেও বেইমানী। বেইমানীর বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করা উচিত। পাত্রদের পরের বার ভোট দেওয়া না দেওয়া নির্ভর করবে জবাবদিহির বিশ্বাসযোগ্যতার উপরে। ওটা কি দলবদল না দল বিভাজন?

সেকালে বৌমাস্টারের দল বলে একটি যাত্রার দল ছিল। সেটি ভেঙে গিয়ে দুটি দল হয়। তখন একটির নাম হয় বৌমাস্টারের দল। অপরটির নাম বৌমাস্টারের ভাঙা দল। একালেও সেই রকম দেখছি জনতা ও জনতা (এস)। তার আগে কংগ্রেস ও কংগ্রেস (আই)। তারও আগে সি পি আই ও সি পি আই (এম)। আধুনিকতম বৌমাস্টারের ভাঙা দলের বক্তব্য ওরাই জনতা দলের সেকুলার অংশ। বাকীটা ধর্মাশ্রিত বা সাম্প্রদায়িক। এ বক্তব্য কতদূর সঙ্গত তা বিচারসাপেক্ষ। কার্যকলাপ দেখেই লোকে এর বিচার করবে। কার্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখতে হবে। ফাঁকা আওয়াজ হয়ে থাকে তা ধরা পড়ে যাবে।

শ্রীচরণ সিংএর কোয়ালিশন সরকার যদি স্থায়ী না হয় এর পরে আসবে শ্রীজগজীবন রামের কোয়ালিশন সরকার। তাঁর সে সরকার যদি স্থায়ী না হয় তবে অকালবোধন করতে হবে। অর্থাৎ অসময়ে সাধারণ নির্বাচন। তাতে এমন কী লাভ হবে? কোয়ালিশন ভিন্ন আর কোন সরকার কি সামনের কয়েক বছরের মধ্যে সম্ভবপর? আমার বড়ো আশা ছিল ইংলণ্ডের মতো ভারতেরও দুই পার্টি পালা করে সরকার চালাবে। তা তো হবার নয়। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যই বারো রাজপুত তেরো হাঁড়ি। এইজন্যেই মোগল এসেছিল, এইজন্যেই ইংরেজ। এর

পরে কে আসছে কে জানে! তবে এখন থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করতে হবে। ফরাসীরাও আশি বছর ধরে কোয়ালিশন সরকারের পর কোয়ালিশন সরকার দেখতে অভ্যস্ত ছিল। প্রায় বছরই সরকার বদলাত। কখনো কখনো বছরে তিনচার বার। তা বলে দেশ অশাসিত ছিল না। ওদের সিভিল সার্ভিস অতি মজবুৎ। যাকে বলে ইস্পাতের কাঠামো। আমাদেরও তেমনি একটি ইস্পাতের কাঠামো ছিল ইংরেজ আমলে। এখনকার কাঠামো ইস্পাতের নয়। একে দুর্বল করা হয়েছে নেহেরু শাসনকাল থেকেই। এখন এই দুর্বল কাঠামোর উপর কোয়ালিশন চাপলে প্রশাসন ভেঙে পড়তে পারে। পনেরোটা ভাষায় পঁচিশটা কেন্দ্রে নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে গেলে যা হবে তা একপ্রকার জুয়াখেলা। কাঠামোটা হবে কার্ডবোর্ডের। তার উপর যাঁরা চাপবেন তাঁরা যদি হন খড়ের মানুষ তা হলে কী হবে সেটা আমি পাঠকদের কল্পনার উপর ছেড়ে দিচ্ছি। কথায় কথায় আর্মিকে ডাকলে অবশেষে আর্মিই সওয়ার হবে!

ধাঁধার জবাব

সম্পাদক মহাশয় আমার কাছে একটি ধাঁধার জবাব চেয়ে পাঠিয়েছেন। ধাঁধাটি হলো এই। কেন্দ্রে ইন্দিরার সরকার আর রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন দলের সরকার ভারতে এই ধরনের রাজনৈতিক রূপরেখা দাঁড়ালে তাতে কি অগ্রগতি বা উন্নয়ন ব্যাহত হবার আশঙ্কা আছে?

দাঁড়াবে কী? দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচকগণ ইন্দিরাজীর দলকে দিয়েছে ৪৯টি আসন আর তাঁর বিরোধী বামফ্রন্টকে ২৩৮টি আসন। এটা যে কেবল রাজ্য কংগ্রেস (ই)র প্রতি অনাস্থাসূচক তাই নয়, নিখিল ভারত কংগ্রেস (ই)র প্রতিও অনাস্থাসূচক। এর ফলে ইন্দিরা সরকার পদত্যাগ করবেন না। লোকসভায় তাঁদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার যদি কেন্দ্রের ইন্দিরা সরকারের সঙ্গে অসহযোগ করে বা ইন্দিরা সরকারই যদি বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে অসহযোগ করে তবে এমন কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই যে মধ্যস্থতা করবে। পশ্চিমবঙ্গ হয়তো একদিন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আইন অমান্য শুরু করে দেবে। আর কেন্দ্র তার উত্তরে রাষ্ট্রপতির শাসন চাপিয়ে দেবে।

এ ধরনের পরিস্থিতি ব্রিটিশ আমলেও দেখা দিয়েছিল। কেন্দ্র ব্রিটিশ সরকারের নিরঙ্কুশ শাসনাধীন। আটটি প্রদেশ কংগ্রেস সরকারের সীমাবদ্ধ শাসনাধীন। মহাযুদ্ধে যোগদানের প্রশ্নে দুই পক্ষ দ্বিমত। কেন্দ্রীয় সরকারের অদলবদলে বড়লাট নারাজ। প্রাদেশিক সরকারের উপর যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দেওয়ায় কংগ্রেস মন্ত্রীরা ক্ষুব্ধ। মধ্যস্থতা করার মতো কেউ ছিলেন না। কেন্দ্রকে অমান্য করলে কেন্দ্র প্রাদেশিক মন্ত্রীদের বরখাস্ত করে লাটসাহেবদের দিয়ে শাসনকার্য চালাত। বরখাস্তের জন্যে অপেক্ষা না করে মন্ত্রীরা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। লাটসাহেবরা প্রশাসনের ভার নেন। মহাযুদ্ধের পরে আবার যখন সাধারণ নির্বাচন হয় তখন সেই আটটি প্রদেশে আবার কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া পাঞ্জাবেও আংশিক কংগ্রেস সরকার। এতগুলো প্রদেশ যদি কেন্দ্রের বিরোধিতা করে তা হলে কেন্দ্রীয় সরকারের

পক্ষে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা অসম্ভব। মন্ত্রীদের পাইকারী ভাবে বরখাস্ত করা যদিও আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছাধীন তবু অসমীচীন। ততদিনে বুঝতে বাকী নেই যে জনসাধারণের অধিকাংশের আস্থা কংগ্রেসের উপরে, অনাস্থা ইংরেজের উপরে। কোনো সরকারই এতখানি অনাস্থার পর নিছক আইনের জোরে টিকতে পারে না। বাধ্য হয়ে আইন বদলাতে হয়। আর নয়তো গায়ের জোর ফলাতে হয়।

ব্রিটিশ সরকার সেই সন্ধিক্ষণে অপসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার দুই ভাগে বিভক্ত হয়। বৃহত্তর অংশটি পড়ে কংগ্রেসের ভাগে। কংগ্রেস সেই অংশটির নাম রাখে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন বা সংক্ষেপে ইণ্ডিয়া। ইউনিয়ন বলতে বোঝায় অনেকগুলি ইউনিটের ইউনিয়ন। এক একটি ইউনিট যেন এক একটি স্তম্ভ। স্তম্ভ নড়ে গেলে ছাদ ভেঙে পড়ে। প্রদেশ বা রাজ্যই হচ্ছে বেসিক' বা মৌল বস্তু। ইউনাইটেড স্টেটসও একটি ইউনিয়ন। ইউনাইটেড কিংডমও একটি ইউনিয়ন। কিন্তু ক্যালিফর্নিয়ার বা টেকসাসের যেমন নিজস্ব আইনসভা ও সরকার আছে স্কটল্যাণ্ড বা ওয়েলসের তেমন নেই। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে তাদের আইনসভা ও সরকার একাকার হয়েছে।

স্বাধীনতার পরে যখন ভারতীয় ইউনিয়নের জন্যে সংবিধান রচনা করা হয় তখন প্রদেশগুলিকে স্টেট বা রাজ্য আখ্যা দিয়ে দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে একত্র করে টেকসাস বা ক্যালিফর্নিয়ার মতো নিজস্ব আইনসভা ও সরকার গঠন্ করতে দেওয়া হয়। সেদিক থেকে আমাদের এটা ফেডারল ইউনিয়ন। যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের। অথচ আমাদের প্রেসিডেন্টকে করা হয় ব্রিটিশ রাজার মতো ক্ষমতা-শূন্য শিরোভূষণ। ক্ষমতার মালিক তিনি নন, তাঁর প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় আইন-সভা বা পার্লামেন্ট থেকে একজনকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। যতদিন তাঁর পেছনে অধিকাংশ সদস্য ততদিন তাঁর প্রাধান্য। প্রেসিডেন্ট কিন্তু পার্লামেন্টের সংখ্যা-গরিষ্ঠদের আস্থানির্ভর নন। যতদিন না তাঁর মেয়াদ পূর্ণ হচ্ছে ততদিন তাঁর স্থায়িত্ব। তিনি স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট।

আমেরিকার মতো ভারতের এক একটি রাজ্যে এক একজন গভর্নর। কিন্তু এঁরা কেউ সেখানকার মতো নির্বাচিত গভর্নর নন। এঁরা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত। এঁরা প্রধানমন্ত্রীর আস্থা হারালে যে-কোনোদিন বিতাড়িত হতে পারেন। অথচ এঁরাই রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তিত হলে রাজ্য মন্ত্রীমণ্ডলীকে

বিতাড়িত করে রাজ্য সরকারের সর্বময় পরিচালক হতে পারেন। আমেরিকায় এটা অভাবনীয়। আর রাষ্ট্রপতির শাসন মানে তো তাঁর বকলমে প্রধানমন্ত্রীর শাসন। এই পরিমাণ ক্ষমতা আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট অথবা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীরও নেই। সংবিধান এত অধিক ক্ষমতা দেওয়া সত্ত্বেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁর পার্টির সদস্যদের ভোটে সংবিধান সংশোধন করিয়ে নিতেও সক্ষম। তাঁর ধারণা 'পার্লামেণ্ট' বলে নামকরণের এমন মহিমা যে আসলে যেটা সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় আইনসভা সেটা নাকি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের মতো 'সোভরেন' ক্ষমতাসম্পন্ন। তাই যদি হয়ে থাকে তো সংবিধান সংশোধনের জন্যে অর্ধেকসংখ্যক রাজ্য আইনসভার অনুমোদন আবশ্যক কেন?

সংবিধানে যে সসীম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাকে অসীম করার আরেকটি উপায় কংগ্রেস পার্টির প্রেসিডেণ্ট পদে নিজের লোককে বসানো কিংবা নিজেই বসা। তা হলে যে-ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রয়োগ করা চলে না সে ক্ষমতা খিড়কি দরজা দিয়ে কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সেনাপতি হিসাবে বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস মন্ত্রী ও আইনসভা সদস্যদের উপরে প্রয়োগ করা চলে। এর নাম এক্স্ট্রাকনস্টিটিউশনাল পাওয়ার। এর উদ্ভাবক ইন্দিরা গান্ধী নন, মহাত্মা গান্ধী। কংগ্রেস হাই কমাণ্ড তাঁরই মানস পুত্র। বিদেশী শাসকদের সঙ্গে পাঞ্জা কষার জন্যে এ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছিল। এখন বিদেশী শাসক নেই, এখন এটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে স্বদেশী রাজ্য সরকারদের উপর সংবিধানবহির্ভূত ক্ষমতা জারির জন্যে। যদি সেসব সরকার কংগ্রেস দলের দলীয় সরকার হয়ে থাকে।

কিন্তু তাদের কোনোটা যদি অন্য কোনো দলের দলীয় সরকার হয়— যেমন পশ্চিমবঙ্গে, ত্রিপুরায়, তামিলনাড়ুতে— তা হলে কী হবে। তাকে তাড়িয়ে দিতে পারা যাবে কি? এই প্রশ্নের উত্তর মেলে সংবিধান রচনার দশ বছরের মধ্যে কেরল রাজ্যে। সেখানে সংবিধানসম্মত উপায়ে কমিউনিস্টরা আইন সভায় নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করেন। সেটাই বোধ হয় পৃথিবীর সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত কমিউনিস্ট সরকার। ভারতেই এটা সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং আমাদের গর্ব করবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে ইউরোপ আমেরিকার চেয়েও আমরা গণতান্ত্রিক উপায়ে বিশ্বাসী। কিন্তু সে সরকারকে তার বিরোধীপক্ষ বেশীদিন টিকতে দেয় না, এমন এক অশান্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যে কেন্দ্রীয় সরকার গভর্নরকে দিয়ে রিপোর্ট লিখিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে মন্ত্রীদের বরখাস্ত করান। আমি এর প্রতিবাদে একটি প্রবন্ধ লিখি। আমি

কমিউনিস্ট বলে নয়, আমি সংবিধানের অপপ্রয়োগে মর্মাহত বলে। গণতন্ত্র বিরোধী-পক্ষকে যে সুযোগ দেয় আর কোনো শাসনব্যবস্থা সে সুযোগ দেয় না। তাই গণতন্ত্রের দেশে বিপ্লব হয় না। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর হয়। কেরলের কমিউনিস্টদের বিপ্লবের পথে ঠেলে দেওয়া হয়। ওদের অবশ্য বিপ্লব ঘটাবার মতো গায়ের জোর ছিল না। ওরাও জাতপাত মানে। জ্যোতিষী গণনায় বিশ্বাস করে। কেরলের একটি ছাত্রী আমাকে বলেছিল, "দেখবেন এ সরকার ছ' মাসের বেশী থাকবে না।" কারণ কী? "কারণ জাতিভেদ প্রথা।" আমি তো হাঁ। মার্কস শুনলে কাঁদতেন।

মানুষের স্বভাবই এই যে তাকে যদি বৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখল করতে না দেওয়া হয় সে অবৈধ উপায় অবলম্বন করবেই। একদা ন্যাশনালিস্টরাও সন্ত্রাসবাদী উপায় অবলম্বন করেছিলেন। অস্ত্রসংগ্রহের জন্যে জার্মানীতে গেছলেন। জাপান-অধিকৃত দেশে গিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা বৈধ উপায়ও আছে, সেই উপায়ে ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করেন ও কংগ্রেস নেতারা ক্ষমতার আসনে বসেন। কিন্তু তাদেরও একটা বিরোধীপক্ষ গড়ে ওঠে। সে পক্ষের সবাই যে কমিউনিস্ট তা নয়, কেউ বা সোশিয়ালিস্ট, কেউ বা দক্ষিণপন্থী, কেউ বা "হিন্দ্, হিন্দু, হিন্দী" মতবাদে বিশ্বাসী। ক্রমেই কংগ্রেসের পুণ্যবল ক্ষীণ হতে থাকে। ত্যাগশক্তি স্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। 'কংগ্রেস' এই লেবেলটাকে ভাঙিয়ে রাজনীতির বেসাতি চলে। কাজেই বিভিন্ন মার্গের বিরোধীপক্ষ দিকে দিকে মাথা তোলে। এমারজেন্সী ঘোষণা করে দাবিয়ে রাখা দুষ্কর হয়। অবশেষে ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস নেতারা কেন্দ্রে গদীচ্যুত হন। মসনদে আরোহণ করে জনতা পার্টি। সংবিধানসম্মত ক্ষমতার হস্তান্তর। এতকাল রাজত্ব করার পর কংগ্রেস হয় বিরোধীপক্ষ।

কিন্তু জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় সরকার কংগ্রেস পার্টির রাজ্য সরকারগুলিকে কিছুতেই তাদের আইন নির্দিষ্ট কার্যকাল সম্পূর্ণ করতে দেবে না। রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিয়ে সংবিধানের অপব্যাখ্যা করে গোটা আষ্টেক রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করাবে। আমি তো হতভম্ব। এই অদূরদর্শী সরকারের পরিণাম হয় অকালে বিদায়। পরবর্তী নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী তাঁর অনুগত কংগ্রেসীদের নিয়ে কেন্দ্রে ফিরে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে সেইসব রাজ্যের জনতা সরকারগুলিকেও সেই একই উপায়ে বরখাস্ত করান। সংবিধানে এমন কোনো কথা নেই যে কেন্দ্রীয় সরকারে রদবদল

হলে তৎক্ষণাৎ রাজ্য সরকারেও রদবদল হবে। কিন্তু কংগ্রেসকে তাড়িয়ে জনতা পার্টি ও জনতা পার্টিকে তাড়িয়ে কংগ্রেস (ই) এইরকম একটা কনভেনশন চালু করেছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার হয়েছে নার্ভাস। গত জুন মাস থেকেই এঁরা বলে আসছেন যে এঁরা বরখাস্ত হতে চলেছেন। বরখাস্ত হবার কীই বা কারণ থাকতে পারে ? আইনসভায় এঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এঁদের বরখাস্ত করলে বিকল্প সরকার গঠন করতে পারা যাবে না। সাধারণ নির্বাচন যতদিন না হয় ততদিন রাষ্ট্রপতির নামে গভর্নর শাসন করবেন। অবাক হয়ে দেখি বিনা দোষে ত্রিভুবন নারায়ণ সিংকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। তবে কি নতুন গভর্নর এসেছেন মন্ত্রীদের কোনো একটা ছুতোয় বরখাস্ত করতে ?

সেরকম কিছু ঘটেনি বটে, কিন্তু ঘটতে পারত। ভারতে একটা অশুভ সূচনা দেখা যাচ্ছে। রাজ্যে যারা সংখ্যালঘু তারা কেন্দ্রের সাহায্যে সংখ্যাগুরু দলকে হটাতে চায়, কিন্তু নিজেরা বিকল্প সরকার গড়তে পারে না, কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাবহ গভর্নরকে শাসনভার দিতে চায়। এর মানে কেন্দ্রে মেজরিটি রুল, রাজ্যে মাইনরিটি রুল। ধৈর্য ধরলে, সেবা করলে, লোকের আস্থা পেলে মাইনরিটিও পরে মেজরিটি হতে পারত। কিন্তু তার মতিগতি অন্যরূপ। যেহেতু কংগ্রেস কেন্দ্রের কর্ণধার সেহেতু কংগ্রেস প্রত্যেকটি রাজ্যে গভর্নর নিয়োগ করবে ও তাঁর মারফৎ রাজ্য-শাসন করবে। এটা উন্নয়ন বা অগ্রগতির পন্থা নয়। চাই সহ-অবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা, সংবিধানকে এক পার্টির সংবিধানে পরিণত না করা।

যেমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ইন্দিরা কংগ্রেস সব ক'টি রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা রক্ষা করতে পারবে না। কোথাও বামপন্থী, কোথাও দক্ষিণপন্থী, কোথাও ভিন্নপন্থী রাজ্য সরকার গঠিত হবেই। আর তারা সেইখানেই থামবে না। কেন্দ্রের কাছ থেকে আরো ক্ষমতা চাইবেই। তার জন্যে আন্দোলন বৈধতার সীমা ছাড়িয়ে যেতেও পারে। কেন্দ্রকে দুর্বল করা আমাদের কাম্য নয়। কেন্দ্র দুর্বল হলে দেশ খণ্ড খণ্ড হয়ে যেতে পারে। অতীতে হয়েছেও। অপর পক্ষে কেন্দ্রকে অত্যধিক প্রবল করলে রাজ্য সরকারগুলি পুত্তলিকা সরকার হয়ে দাঁড়ায়। সেটাও কি বাঞ্ছনীয় ? যে দেশে বিভিন্ন মতবাদ কাজ করছে সে দেশে কোনো একটা মতবাদই সর্বেসর্বা হবে, আর-সব মতবাদ কোনঠাসা হবে, এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম গৃহযুদ্ধ। এটা এড়ানোর জন্যেই পার্টিশন। পরে আবার পার্টিশন প্রয়োজন হতে পারে।

এইসব কথা ভেবে আমি পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসীর পরিবর্তে প্রেসিডেনশিয়াল

ডেমোক্রাসীর পক্ষপাতী নই। বৈধ অবৈধ যে কোনো উপায়ে একজন হিটলার কি স্টালিন প্রেসিডেন্টের সিংহাসনে আরোহণ করলে তাঁর গভর্নরদের মারফৎ তিনি প্রত্যেকটি রাজ্য শাসন করবেন। বিরোধীরা আন্দোলন করলে তিনি তাঁদের নির্মূল করবেন। সিংহাসন থেকে অবরোহণের পথ খোলা না থাকলে আমরণ তিনি স্বস্থানে বহাল থাকবেন। পাঁচবছর অন্তর সাধারণ নির্বাচন হবে না, হলে তাঁর দলটিই একমাত্র নির্বাচনপ্রার্থী হবে। প্রেসিডেনশিয়াল ডেমোক্রাসী যদি আমেরিকার মতো হয় তা হলে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সম্পর্ক এখনকার মতোই থাকবে। দিল্লীতে এক দলের সরকার, কলকাতায় আরেক দলের সরকার। সহ-অবস্থানের নীতি গৃহীত না হলে পরস্পরের বিরোধিতায় উভয় সরকারই নাজেহাল হবে। অতিকেন্দ্রীকরণ এর প্রতিকার নয়। আবার অতিবিকেন্দ্রীকরণও বাঞ্ছনীয় নয়। সংবিধানে যাকে যে ক্ষমতা দিয়েছে তারই সদ্ব্যবহার শ্রেয়। সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতা বর্জনীয়।

ভারতের যিনি রাষ্ট্রপতি সেনাবাহিনীরও তিনি সংবিধানসম্মত মহাসেনাপতি। এর উপরেও যদি তিনি কংগ্রেস (ই) হাই কমাণ্ডেরও অধিনায়ক হন তবে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন হয়ে দাঁড়াবে আর একটি ইউনিয়নের দোসর। তার নাম সোভিয়েট ইউনিয়ন। সেখানকার পার্টিপ্রধানই হচ্ছেন রাষ্ট্রপ্রধান বা রষ্ট্রপ্রধানই হচ্ছেন পার্টিপ্রধান। ও পথে সমাজতন্ত্র সম্ভব হতে পারে, গণতন্ত্র অসম্ভব।

আপেল বনাম আপেল শকট

ছেলেবেলায় পড়েছি সেকালে এক জ্যোতির্বিদ অন্ধকার রাত্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা গুনতে গুনতে মাঠের মাঝখানে খুঁড়ে রাখা এক পাতকুয়ায় পড়ে গিয়ে প্রাণ হারান। সেটা ইতিহাস না কিংবদন্তী অত কথা আমার স্মরণ নেই।

তার সঙ্গে তুলনা করতে পারি একালের একটি চমকপ্রদ ঘটনার। আমরা যখন আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আমাদেরি তৈরি উপগ্রহ 'আপেল' সম্বন্ধে খোঁজখবর নিচ্ছি তখন আমাদের কানে খবর আসে তামিলনাড়ুর মীনাক্ষীপুরম্ গ্রামের হরিজনরা সদলবলে হিন্দুসমাজ থেকে মহানিষ্ক্রমণ করেছে। তারা খ্রীস্টানও হয়নি, বৌদ্ধও হয়নি, মার্কসবাদী নাস্তিকও হয়নি, হয়েছে আরবীনাম গ্রহণ করে মুসলমান। দেখা হলে বলছে, "সালাম আলায়কুম।" ছেলেরা কোর্তা পায়জামা পরছে, মেয়েরা পর্দার আড়ালে থাকছে। সবাই পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ছে। গ্রামের মাঝখানে মসজিদ উঠছে। দাড়ি গোঁফ গজিয়ে ওরা এখন অন্য এক 'রেস'। এর পরে শোনা যাবে অন্য এক 'নেশন'। সংখ্যা আপাতত সাতশো আটশো, কিন্তু অন্যান্য গ্রামের হরিজনরাও যদি ওদেরই পথ ধরে তবে দশ বিশবছর পরে রব উঠবে, চাই আর একটি হোমল্যাণ্ড। দক্ষিণ পাকিস্তান। তার মানে আরো একবার দেশভঙ্গ। বহু লোক কোতল। বহুতর শরণার্থী। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

আমাদের দেশটা কি তা হলে একটা আপেলবোঝাই ঠেলাগাড়ী, যা একটু চাপ বাড়লে বা কমলে উলটিয়ে যায়? ইংরেজীতে যাকে বলে অ্যাপল কার্ট। এই যে আমরা ষাট থেকে সত্তর কোটি মানুষ চেপে বসেছি, কিসের ভরসায় গড় গড় করে এগিয়ে যাচ্ছি, যদি পথের মাঝখানে গাড়ী যায় উলিটিয়ে, ছিটকে পড়ে কয়েক কোটি মানুষ, তাদের কয়েক লক্ষ গড়াগড়ি যায়? এটা শুধু হিন্দুসমাজের ঘরোয়া ব্যাপার নয়, ভারতীয় নেশনেরও ঘরোয়া ব্যাপার। শুধু হিন্দুসমাজ নয়, ভারতীয় নেশনও লণ্ডভণ্ড হতে পারে। যেমন আমেরিকার নিগ্রোরা পাইকারিহারে মুসলমান হয়ে গেলে আমেরিকান নেশন। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ খ্রীস্টানদের টনক নড়েছে। নিগ্রোদের

এখন আর তেমন হেলাফেলা করা হয় না। এক এক করে তাদের অভিযোগ দূর করা হচ্ছে। যথেষ্ট সম্মানও দেখানো হচ্ছে তাদের। এই তো সেদিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রেগন আর্লিংটন সামরিক গোরস্থানে শেতাঙ্গ সেনাপতিদের কবরের পাশে একজন কৃষ্ণাঙ্গ সেনাপতিরও মৃতদেহ সমাহিত করার আদেশ দিলেন। এ সম্মান এই প্রথম।

কলেজে আমার ছাত্রজীবনে একজন আমেরিকান অধ্যাপকের লেখা একখানি বই আমার হাতে পড়েছিল। নিগ্রো সমস্যার একমাত্র সমাধান তাঁর মতে নিউ গিনি বা তেমনি কোনো এক দ্বীপে নিগ্রোদের জন্যে একটি উপনিবেশ স্থাপন ও সেখানে আমেরিকার নিগ্রোদের সকলের পুনর্বাসন। যেন নিগ্রোদের ইচ্ছা অনিচ্ছা সম্মতি অসম্মতি বলে কিছু নেই। তারা ক্রীতদাস বা চ্যাটেল। অথচ অধ্যাপক মহাশয় বিংশ শতাব্দীরই মানুষ, গণতন্ত্রে ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তখনো ফাসিস্ট বা নাৎসীদের বর্ণান্ধতা দেখা দেয়নি। আমি তো রীতিমতো শক পাই। আমেরিকার নিগ্রোরা সেদেশে শ্রমিকের অভাব পূরণের জন্যেই চালান হয়েছিল। শ্রমিকের অভাব কি মিটেছে? যেসব নিকৃষ্ট কাজ আর কেউ অত কম মজুরিতে করে না ও করবে না সেইসব কাজ অধ্যাপক মশায় কাকে দিয়ে করাবেন? সেই বা রাজী হবে কেন? আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও জখম হবে যদি নিগ্রোদের অন্যত্র পাঠানো হয়। শুধু অর্থনৈতিক নয়, রণনৈতিক ব্যবস্থাও। তাই নিগ্রোরা সেদেশে শিকড় গেড়ে বসেছে, পণ্ডিতদের বিপরীত মন্ত্রণাসত্ত্বেও।

আমেরিকার আদিবাসী তথাকথিত রেড ইণ্ডিয়ানদের মতো ভারতবর্ষেও অতি প্রাচীন কাল থেকে তফশীলভুক্ত উপজাতি বলে চিহ্নিত বহুধাবিভক্ত আদিবাসী বাস করছে। এদের কতক খ্রীস্টান হয়েছে, কতক হয়েছে বৈষ্ণব, কতক বৌদ্ধ, কিন্তু অধিকাংশই ইংরেজীতে যাকে বলে অ্যানিমিস্ট। যারা হিন্দু বলে পরিচয় দিচ্ছে তারা ট্রাইব বলে গণ্য, কাস্ট বলে নয়। তবে তফশীলভুক্ত কাস্ট বলে যাদের পরিচিতি তাদের কতক হয়তো আগে ছিল ট্রাইব, পরে হয়েছে কাস্ট। রোম যেমন একদিন গঠিত হয়নি হিন্দুসমাজও তেমনি এক-আধ হাজার বছরে গঠিত হয়নি। আর্যভাষীরাও একদা ট্রাইব বলে বিদিত ছিল। আর্যভাষীদের সমাজও ছিল আদিতে ট্রাইবাল সমাজ। বিংশ শতাব্দীতে আর্যভাষীদের আর্যজাতি অভিহিত করা হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই ভ্রান্তি থেকে নাৎসীদের আর্যরক্তের বিশুদ্ধিতার দম্ভ। আর আমাদের পণ্ডিতদের আর্যত্বের অভিমান। তাঁরা ধরে নেন যে 'আর্যাবর্ত' ছিল

আর্য নামক একটি 'রেস' কর্তৃক অধ্যুষিত একটি দেশ। কিন্তু তার সীমানা তো তিন দিকে সাগর ও চতুর্থ দিকে পর্বতবেষ্টিত ছিল না। তার বাইরে যারা ছিল তাদের তো অন্য দেশ। এতে আমাদের একদেশতত্ত্ব জোরদার হয় না। একজাতিতত্ত্বও না। অথচ সবাই জানে যে আর্যভাষাগুলির পরিধি আরো ব্যাপক। আফগানিস্থানে, ইরানে, জর্জিয়ায়, মূল রাশিয়ায়, ইউরোপের অধিকাংশ দেশে আর্যভাষাগুলির অবস্থান। তাও অন্তত তিন হাজার বছর ধরে। ইদানীং ইউরোপীয় পণ্ডিতরা 'আর্যজাতির' অস্তিত্ব অস্বীকার করছেন। ভাষা আর রক্ত এক জিনিস নয়। ভাষা থেকে জাতি বিচার করা যায় না। এটা তো জাজ্বল্যমান সত্য যে বাংলাভাষা বাঙালী মুসলমানদেরও মাতৃভাষা। ভাষার নিরিখে তারাও আর্য, কিন্তু রক্তের নিরিখে তারা আরব, ইথিওপীয়, ইরানী, তুরানী, মুঘল অর্থাৎ মঙ্গোলদের সঙ্গে মিশ্রিত। বাঙালী হিন্দুরা যে নৈকষ্য আর্য নয় তাও আজকাল সকলেই মানেন। জাতিহিসাবে তারাও মিশ্র। আর্যের চেয়ে দ্রাবিড়ের ভাগই বেশী। অস্ট্রিক ভাগটাও কম নয়।

হিন্দুদের সমাজগঠন কোনো একটা ফরমুলা ধরে হয়নি। ধর্মবিশ্বাস অনুসারে তো নয়ই। আসামের অহোমরা, ত্রিপুরার টিপরিরা বিগত সাত শতকের মধ্যেই হিন্দুসমাজভুক্ত হয়েছে। মণিপুরীদের বেলাও সেকথা খাটে। রাজারা বৈষ্ণব বা শাক্ত দীক্ষা নেবার পর ক্ষত্রিয় বলে গণ্য হন। অন্যান্যদের জন্যে এক একটি জাত অর্থাৎ কাস্ট নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সাধারণত বৃত্তি অনুসারেই জাত বা কাস্ট। কখনো কারো মাথায় আসেনি যে কতকগুলি জাতকে পরে একসময় তফশীলভুক্ত করা হবে। কোচ ট্রাইবের থেকে সম্ভূত রাজবংশীরাও হবে তফশীলভুক্ত। মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় 'হরিজন'। নামে কী আসে যায়? নামকরণের সময় যে যেখানে ছিল সে সেইখানেই রয়েছে। যেমন রাষ্ট্রের চোখে তেমনি সমাজের চোখে। সমাজ কাউকে প্রমোশন দিয়ে বর্ণ হিন্দু করেনি, যদিও রাষ্ট্র প্রমোশন দিয়ে পিয়নকে কেরানী ও কেরানীকে অফিসার করেছে। আসলে এটা হিন্দুসমাজেরই মাথাব্যথা, ভারতরাষ্ট্রের নয়, কারণ ভারত রাষ্ট্র হচ্ছে ধর্মনিরপক্ষে রাষ্ট্র। একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে তফশীলভুক্ত কাস্ট ও ট্রাইবদের জন্যে আইনসভায় আসন সংরক্ষণের ও সরকারী চাকরিতে পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সময়সীমা বার বার বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বরাবর বাড়িয়ে দেওয়া যাবে না। সেটা একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। অথচ হিন্দুসমাজের বর্ণাবর্ণ ব্যবস্থা হচ্ছে স্বয়ং ব্রহ্মার সৃষ্টি। কার সাধ্য তার পরিবর্তন করে। একজন 'হরিজন' যদি বর্ণ হিন্দু হতে চায় তাকে

তাকে প্রথমত পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতে হবে, তার পর পুনর্জন্মের জন্যে পুণ্যসঞ্চয় করতে হবে, তার পর মরতে হবে, তার পর আবার জন্মাতে হবে। তাও একবার নয়, বহুবার।

হিন্দুধর্ম হাজার উদার হলেও নিম্নতম জাতের মানুষকে ইহজন্মে উন্নততর মর্যাদার আশা ভরসা দেয় না। উল্টে উচ্চতম জাতের মানুষকে ভয় দেখায় তাকে এইজন্মেই পতিত করা হবে, তার পুত্রপৌত্রদেরও। স্বর্গীয় প্রফুল্লকুমার সরকার আমাকে বলেছিলেন, "জানো তো, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। পিরালী বামুনের মেয়েকে যে বিয়ে করবে সেও পিরালী হবে, তাদের বংশের প্রত্যেককে পিরালী করা হবে, তাদের যারা বিয়ে করবে তারাও পিরালী হবে, তাদের বংশের প্রত্যেকেই হবে পিরালী।" জগৎ কবিসভায় মর্যাদার আসন পেলেও স্বদেশের ব্রাহ্মণসমাজে বিশ্বকবির মর্যাদা একতিলও বৃদ্ধি হয়নি। এ বেদনা তিনি আজীবন বহন করে গেছেন। অন্যে পরে কা কথা! তবে এই শতাব্দীতে একটা সহজ উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। উপবীত ধারণ করে বৈদ্যরা বলছেন ওঁরা ব্রাহ্মণ, কায়স্থরা বলছেন ওঁরা ক্ষত্রিয়, সাহারা বলছেন ওঁরা বৈশ্য, ওঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গয়লারা হয়েছেন যদুবংশীয় ক্ষত্রিয় অর্থাৎ যাদব, নাপিতরা নৈব্রাহ্মণ, ছুতোররা বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণ, আগুরিরা উগ্রক্ষত্রিয়, বাগদীরা ব্যগ্রক্ষত্রিয়, পোদরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। নমঃশূদ্রদের পুরোহিতরা বাড়ুয্যে চাটুয্যে লাহিড়ী বাগচী পদবী ধারণ করছেন। তাঁরাও ব্রাহ্মণ। অথচ তফসীলভুক্ত।

তাই বাংলাদেশে মুসলমান হওয়ার হিড়িক থেমে গেছে। আমাদের ছেলেবেলায় কিন্তু প্রায়ই কাগজে বেরোত অমুক গ্রামের নমঃশূদ্ররা জাতকে জাত ইসলাম গ্রহণ করেছে। কারণ হিন্দু থাকলে ধোপা তাদের কাপড় কাচবে না, নাপিত তাদের ক্ষৌরি করবে না। মুসলমান হলে সেই ধোপাই আর সেই নাপিতই তাদের প্রয়োজন মেটাবে। তাতে কোনো ধোপার জাত যাবে না, কোনো নাপিত সমাজচ্যুত হবে না। হিন্দুসমাজ যেন প্রকারান্তরে বলছে তথাকথিত ছোট জাতের লোককে মুসলমান খ্রীস্টান হয়ে ধোপা নাপিতের সাহায্য পেতে। এমনি করে কত লোক যে স্বেচ্ছায় ধর্ম বদল করেছে তার লেখাজোখা নেই। পৈতে নেওয়া চালু হওয়ার পর এটা বন্ধ হয়েছে। এতে পুনর্জন্মের ফল ইহজন্মেই পাওয়া যাচ্ছে। মহাত্মা যাই বলুন লোকে হরিজনকে তেমন শ্রদ্ধা করে না উপবীতধারীকে যেমন করে। তারা তফসীলভুক্ত কি না খোঁজ করে না। পদবীগুলোও তারা পাল্টে

দিয়েছে। মুখ দেখেও চেনা যায় না কে কী। লক্ষ লক্ষ লোক কায়স্থ বলে সেনসাস রিপোর্টে সুমারি হয়েছে। অনেকেই দাস থেকে দে, দে থেকে চৌধুরী। বহু লোক হয়েছে রায়। সাহাকে আমি রায় হতে দেখেছি। একটা অ্যাফিডেফিটই যথেষ্ট। জন্মান্তরের কী দরকার?

মীনাক্ষীপুরমের অস্পৃশ্যদের স্পৃশ্য করতে পারলে তারা হয়তো ইসলাম কবুল করত না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্পৃশ্যের অধিকারও দিতে হতো। তারা সমকক্ষের মতো মাথা উঁচু করে রাজপথ দিয়ে হাঁটত, কাউকে হেঁট হয়ে প্রণাম করতে হতো না, কারো পায়ের ধুলো নিতে হতো না। ঘোড়ায় চড়তে পারত, সাইকেলে চড়তে পারত, সাধারণ কুয়ো থেকে জল তুলতে পারত, পুষ্করিণীতে স্নান করতে পারত, সাধারণ স্কুলে একই বেঞ্চে বসতে পারত। হাসপাতালে পাশাপাশি বেডে শুতে পারত, মন্দিরে অবাধ প্রবেশ পেতো, ভোজনাগারে সমান আসন পেতো। কিন্তু নিম্নতম বৃত্তির জন্যে সমাজের কতক লোককে যদি চিরকাল নির্দিষ্ট করা হয় আর তাদের পারিশ্রমিকও চিরকাল স্বল্পতম হয় তবে তাদের মানমর্যাদাও হবে চিরকাল সবার নীচে ও সবার পিছে। উপবীত ধারণেও এর প্রতিকার হবে না। হতে পারে ইসলাম বরণে। খ্রীস্টানরাও উচ্চনীচ ভেদ মানে। মানে না মুসলমানরা। তবে বিয়ে সাদীর বেলা মুসলমানরাও বাছবিচার করে। মীনাক্ষীপুরমের নয়া মুসলমানদের নসীবে এ শিক্ষা বাকী আছে। বাধ্য হয়ে নিকটসম্পর্কীয় ভাইবোনের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে।

ভারতবর্ষের একটা বৈশিষ্ট্যই হলো এই যে, এদেশে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক আর খ্রীস্টানই হোক আর শিখই হোক, বৌদ্ধই হোক আর জৈনই হোক বিয়ে সাদীর বেলা যে যার জাত মেনে চলে। অর্থাৎ রাজপুত মুসলমান জাট মুসলমানকে বিয়ে করবে না, চাষী মুসলমান তাঁতী মুসলমানকে বিয়ে করবে না, যদিও তার নতুন নাম মোমিন। মারা যাবার আগে বাপ তার ছেলেকে ডেকে তার কানে কানে বলে. "মনে রাখিস আমাদের অমুক গোত্র।" একই ব্যাপার ভারতীয় খ্রীস্টান সমাজেও। শিখ সমাজেও। বৌদ্ধ সমাজেও। জৈন সমাজেও। এক বাঙালী লেখিকার উপন্যাসে পড়েছি নবদীক্ষিত খ্রীস্টানরা বলছে, "আমরা ধর্ম দিয়েছি. কিন্তু জাত দিইনি।" জাত বা কাস্ট এদেশে ধর্মের চেয়েও প্রবলতর শক্তি। এ সত্য যারা জানে না তারা এদেশের সম্বন্ধে কিছুই জানে না। আমাদের এক বাঙালী বন্ধুর জার্মান পত্নীর মুখে শুনেছি তাঁর বাবা ছিলেন মালাবারের এক জার্মান প্রটেস্টাণ্ট মিশনারী। স্পৃশ্য খ্রীস্টান আর অস্পৃশ্য খ্রীস্টানের মধ্যে পার্থক্য করতেন না বলে স্পৃশ্য খ্রীস্টান মহলে

তিনি অপ্রিয় হন। মিশন থেকে তাঁর উপর চাপ আসে, যস্মিন্‌ দেশে যদাচারঃ। পার্থক্য তাঁকে মানতেই হবে, নইলে খ্রীস্টধর্মের প্রচার ব্যাহত হবে। তিনি বলেন এটা তাঁর বিবেকবিরুদ্ধ, তাই কর্মে ইস্তফা দেন। এক কপর্দকও ঘরে ছিল না, দেশে ফিরে যাবার পাথেয়ও না। তবু তিনি অটল। কাল তিনি কী খাবেন ও পরিবারকে খাওয়াবেন তা তিনি জানতেন না। কিন্তু প্রতিদিন ভোরে উঠে দেখতেন কে বা কারা তাঁর দোরগোড়ায় রেখে গেছে একঝুড়ি ফলমূল রুটি পনীর। দক্ষিণ ভারতে আজপর্যন্ত এ সমস্যার সমধান হয়নি, তাই যারা হিন্দুসমাজ ত্যাগ করতে চায় তারা খ্রীস্টান না হয়ে মুসলমান হয়। মীনাক্ষীপুরমেরই কয়েকটি খ্রীস্টান পরিবার নাকি মুসলমান হয়ে গেছে। কিন্তু ধর্ম পরিবর্তন করলে কী হবে, যে যার জাত আঁকড়ে ধরে থাকবে, বিয়েসাদীর বেলা মনে রাখবে।

বছর ষাটেক আগে হিন্দুসমাজের টনক নড়ে। আর্যসমাজীরা মালকানা রাজ-পুতদের ইসলামের কোল থেকে ফিরিয়ে আনে। সেসময় যে অনুষ্ঠান হয় তাকে বলা হয় শুদ্ধি অনুষ্ঠান। তার মানে ওরা এতদিন অশুদ্ধ বা অপবিত্র ছিল, এখন আবার শুদ্ধ হলো, পবিত্র হলো। এতে মুসলমানদের আঁতে ঘা লাগে। তাঁরা অপমান বোধ করেন। তাঁদের ধারণা ছিল তাঁরাই পাক অর্থাৎ পবিত্র, অন্যেরা না-পাক, অপবিত্র। শেষপর্যন্ত এর জের গড়ায় পাকদের জন্যে পাকিস্তান হাসিলে। শুদ্ধি আন্দোলন বাধা পায় কতকটা স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নিধনের জন্যে, কতকটা তার চেয়ে গভীরতর কারণে। ধর্মান্তরিত রাজপুতরা না হয় রাজপুত জাতে ফিরে আসতে পারল, কিন্তু ধর্মান্তরিত জেলে, ধোপা, বাগদী, বাউরি, ভুঁইমালী, কাপালীরা শুদ্ধ হয়ে ফিরে আসবে কোন জাতে? হিন্দুজাত বলে তো কোনো জাত নেই। হিন্দু-সমাজ বলে যা আছে তা দু'তিন হাজার জাতের একটা শিথিল ফেডারেশন। শুদ্ধির পরে যদি চামার আবার চামার হয়, হাড়ি আবার হাড়ি হয়, ডোম আবর ডোম হয় আর তাদের বৃত্তিও হয় আগের মতো নীচ আর উপার্জনও তেমনি সামান্য তবে তাদের হীনতা গেল কোথায়, দীনতা গেল কোথায়? ব্রাহ্মণও স্বধর্মে ফিরে এসে মেয়ের জন্যে পাত্র পায় না, কায়স্থও তাই। মুসলমান থাকলেই বরং মেয়ের বরও জুটত, ছেলের চাকরিও জুটত।

আবার শুদ্ধির ঢেউ উঠেছে। নয়া মুসলমানদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। কিন্তু ফিরে এসে তারা যদি তেমনি হীন ও তেমনি দীন থেকে যায় তবে এ ঢেউটাও মিলিয়ে যাবে। একমাত্র প্রতিকার একপ্রকার না একপ্রকার সমাজবিপ্লব, তা সে

মার্কসের প্রেরণাতেই হোক আর গান্ধীর প্রেরণাতেই হোক। জন্মান্তরবাদেরও নতুন ব্যাখ্যা চাই। কর্মবাদেরও। যাতে সামাজিক অন্যায় সমর্থন না পায়। যা এতদিন পেয়ে এসেছে।

'শুদ্ধি' কথাটা আমার মতে অমর্যাদাকর। যাকে তুমি শুদ্ধ করতে চাও সে কি তোমাদের চেয়ে কম শুদ্ধ? তেমনি 'পাক' কথাটাও অমর্যাদাকর। যাকে তুমি 'পাক' করতে চাও সেও কি তোমার চেয়ে কম 'পাক'? সোজাসুজি স্বীকার করতে হবে যে মানুষমাত্রেই শুচি। জন্মের দরুন বা বৃত্তির দরুন কেউ অশুচি নয়। সমাজে যদি মেথর বলে একটা বৃত্তি থাকে তবে কতক লোককে মেথর হতে হবেই। নইলে সমাজ অচল হবে। সেকালে তাদের বাধ্য করা হতো। একালে বাধ্য করা যাবে না। অর্থনৈতিক পেষণ না থাকলে মানুষ আপনি সে বৃত্তি ছেড়ে দেবে। বহুক্ষেত্রে ছেড়ে দিচ্ছেও। অন্য বৃত্তি গ্রহণ করার স্বাধীনতা আগেকার দিনে ছিল না। এখনকার দিনে যার যাতে লাভ সে তেমন বৃত্তি অবলম্বন করছে। ব্রাহ্মণের সন্তানও জুতোর দোকানে খরিদদারের পায়ে জুতো পরিয়ে দিচ্ছে। আর মুচির সন্তানও নির্বাচনে জিতে মন্ত্রী হচ্ছে ও ব্রাহ্মণসন্তানকে দাঁড় করিয়ে রাখছে। কিন্তু এসব পরিবর্তন হিন্দুসমাজের কাঠামো বদলে দিচ্ছে না। তার ওলটপালট ঘটাচ্ছে না। বিপ্লব মানে আর কিছু নয়, ওলটপালট। প্রধানমন্ত্রী হলেও বাবু জগজীবন রাম তাঁর স্বগ্রামে গিয়ে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা পাবেন না, দারোগারা তাঁকে সেলাম ঠুকবে, কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রা তাঁকে প্রণাম করবেন না, তাঁর সঙ্গে ও তাঁর স্বজাতির সঙ্গে সামাজিক অনুষ্ঠানে পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসবেন না। অসবর্ণবিবাহ তো দূরের কথা। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ কন্যা। কিন্তু পারসীকে বিবাহ করার ফলে তাঁর স্বজাতির সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁকে শুনেছি ঘরের বাইরে আসন দেওয়া হতো। আজকাল কী হয় জানিনে। তবে হিন্দুসমাজকে ধন্যবাদ দিতে হবে, তাঁর পুত্রদ্বয়কে হিন্দু বলেই স্বীকার করা হয়। সেটা বোধহয় তাঁদের রাজনৈতিক প্রভাবের দরুন। নয়তো ওঁরা ম্লেচ্ছ বা যবন বংশধর।

বিপ্লব না হোক, বিবর্তন তো হচ্ছে। চার বর্ণের স্থান নিচ্ছে চার শ্রেণী। বৃত্তি অনুসারে নয়, বিত্ত অনুসারে। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, বিত্তহীন। এই শ্রেণীভিত্তিক সমাজেও তথাকথিত হরিজনরা সাধারণত সবার নীচে ও সবার পিছে। এই দীনতা কি ধর্মান্তর গ্রহণ করলেই দূর হতে পারে? মুসলমানদের মধ্যেও কি বিত্তহীন বলে একটি শ্রেণী নেই? মুসলিমপ্রধান দেশগুলিতেও একইরকম বিত্ত-

হীনতা। তেরোশ' বছর পরেও সেসব দেশের অধিকাংশ মানুষ নিম্নবিত্ত ও বিত্ত-হীন। হঠাৎ এদের কয়েকটি দেশের মাটিতে পেট্রোলিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছে বলে বিদেশ থেকে সমৃদ্ধির জোয়ার এসেছে, কিন্তু বিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে পেট্রোলিয়ম নিঃশেষ হলে সমৃদ্ধিতে ভাঁটা পড়বে। জোয়ার বা ভাঁটা কোনোটাই ধর্মের উপর নির্ভর করে না। ধর্মকে এর মধ্যে টেনে আনার কী সার্থকতা? তবু বহুলোকের ধারণা মুসলমান বলেই আরবরা ধনী, অতএব মুসলমান হলেই হরিজনরাও ধনী হবে। এ ধারণা যদি তাদের মনে জন্মিয়ে থাকে তবে তাদের নসীবে আছে মোহভঙ্গ। ইরানের তথাকথিত ইসলামী বিপ্লবও ভারতের মুসলমানদের মনে আরো এক ধারণার জন্ম দিয়েছে। যারা ভারতরাষ্ট্রের সংখ্যালঘু হয়ে সুখ সমৃদ্ধির স্বাদ পাচ্ছে না তারা ভাবছে ভারতেও সেই ধরনের একটা ইসলামী বিপ্লব ঘটলে তাদেরও বরাত ফিরে যাবে। এদেরও একদিন মোহভঙ্গ হবে। বিপ্লব যদি কখনো ভারতের মাটিতে ঘটে তবে তা ধর্মের নামে ঘটবে না. ঘটলে বহুধা বিভক্ত হয়ে ব্যর্থ হবে। সার্থক বিপ্লবের অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত ধর্মনিরপেক্ষ সমদর্শিতা। সেটা ইরানে অবহেলিত। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করতে ইসলামের কাছ থেকে নৈতিক বল সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল, সেদিক থেকে সে বিপ্লব সার্থক। ইসলামের ভূমিকা ওই পর্যন্তই। বাকীটা পেট্রোলের মহিমা। তাতেও একদিন টান পড়বে। তখন রাজতন্ত্রের যে গতি মোল্লাতন্ত্রেরও সেই গতি।

সংহতির সঙ্কট

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি সব সময় হয় না। কখনো কখনো হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার আইরিশ নেতাদের স্বায়ত্তশাসন দিতে স্বীকৃত হন। সারা আয়ার্ল্যাণ্ডকে শাসন করবে ডাবলিনে অবস্থিত একচ্ছত্র সরকার। এমন সময় উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের নেতারা বিদ্রোহের হুমকি দেন। কিছুতেই তাঁরা ক্যাথলিক মেজরিটির শাসন মেনে নেবেন না। তাঁদের প্রস্তাব আয়ারল্যাণ্ডকে দু'ভাগ করা হোক। একভাগ পাবে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের প্রটেস্টান্ট মেজরিটি। আরেক ভাগ অবশিষ্ট আয়ারল্যাণ্ডের ক্যাথলিক মেজরিটি। উত্তর আয়াল্যাণ্ড ব্রিটিশ সরকারের ছত্রাধীনে আলাদা একটি সরকার গঠন করবে। বেলফাস্ট তাদের রাজধানী। তাদের প্রতিনিধিরা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে বসতে পারবেন। নিজেদের বিধানসভাতেও।

বিদ্রোহ এড়াবার জন্যে ব্রিটিশ কর্তারা আইরিশ জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে আবার কথাবার্তা চালান। নেতাদের বলা হয় যে তাঁরা যদি উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের উপরে দাবি ছেড়ে দেন তবে তাঁরা স্বায়ত্তশাসনের চেয়ে আরো বেশী পাবেন। সর্বময় ক্ষমতা তাঁদের হবে। ব্রিটেন হস্তক্ষেপ করবে না। এলাকার দিক থেকে কম পড়বে, ক্ষমতার দিক থেকে বাড়বে। আইরিশ ফ্রী স্টেট যে-কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের তুল্য হবে। গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে আইরিশ জাতীয়তাবাদী নেতারা সেই প্রস্তাবে সম্মতি দেন। আয়ারল্যাণ্ড স্বাধীনও হয়, বিভক্তও হয়। ডি ভালেরা প্রমুখ চরমপন্থীএর বিরোধিতা করলেও জনমত এই মর্মে মিটমাট সমর্থন করে। গৃহযুদ্ধের জন্যে জনসাধারণ প্রস্তুত ছিল না। গৃহযুদ্ধ বাধলে ব্রিটেন নিশ্চয়ই উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের প্রটেস্টাণ্টদের মদত দিত। জাতীয়তাবাদীদের দুই শত্রুর সঙ্গে লড়তে হতো। পরাজয় ধ্রুব। আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামের জের কতকাল চলত কে জানে! অধিকাংশ নাগরিক ক্লান্ত। অধিকাংশ নেতা ক্লান্ত ঘোড়ার সওয়ার হয়ে কতদূর যেতেন? অক্লান্ত যারা তারা আজকেও অক্লান্ত। যদিও কেটে গেছে ষাট বছর। এখনো

সফল হননি। অস্ত্র আছে, পেছনে জনবল নেই। সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের দ্বারা উত্তর আয়ারল্যাণ্ড দখল করা যাবে না। শুধু মানুষ মরবে।

এরই পুনরাবৃত্তি ঘটে ভারতবর্ষে। নেতারা ক্যাবিনেট মিশন স্কীম গ্রহণ করলে দেশ ও প্রদেশ অবিভক্ত থাকত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকত কেবল প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা। স্বরাষ্ট্র থাকত না, অর্থ দফতর থাকত না, বাণিজ্য থাকত না, আইন থাকত না। নিচের তলায় প্রদেশগুলি তিনটি সারিতে বিন্যস্ত হতো। গ্রুপগুলি অর্ধস্বাধীন। যে যার নিজস্ব মুদ্রা চালাত, আমদানী রফতানির শুল্ক আদায় করত, আভ্যন্তরীণ ছাড়পত্র দিয়ে গমনাগমন নিয়ন্ত্রণ করত। যে যার সংবিধান রচনা করে প্রদেশের ক্ষমতা খর্ব করতে পারত। সেই ভয়টা ছিল আসামের লোকের। তিনটের মধ্যে দুটো গ্রুপ হতো মুসলিম লীগের ঘাঁটি। একটা কংগ্রেসের। উপর তলার কেন্দ্রীয় সরকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারত না। আর করবেই বা কী করে? সেটা তো কংগ্রেস সরকার নয়, কংগ্রেস-লীগ সরকার। সম্ভবত তৃতীয় আসনটি একজন শিখের। সে রকম সরকার একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারত না।

মুসলিম লীগ নেতারা সংবিধান সভায় যোগ দিলে হয়তো কংগ্রেস নেতাদের তাঁদের একটা ঘরোয়া আদানপ্রদান হয়ে যেত। তাঁরা কিছু ছাড়তেন, কিছু পেতেন। কংগ্রেস নেতারাও কিছু ছাড়তেন, কিছু পেতেন। দেশ তথা প্রদেশ অবিভক্তই থাকত। ভাগাভাগিটা হতো শাসনক্ষমতার ও চাকরিবাকরির। লীগ নেতারা অনুপস্থিত থাকলে কংগ্রেস একাই একটা সংবিধান রচনা করতে পারত, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার মুসলিম লীগ নেতাদের সেটা গ্রহণ করতে বাধ্য করতেন না। কারো সঙ্গে কোনো সেটলমেণ্ট না করেই ভারত থেকে বিদায় নিতেন। তখন বেধে যেত গৃহযুদ্ধ। কংগ্রেসের লক্ষ্য শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর। গৃহযুদ্ধ পরিহার করার জন্যে কংগ্রেস মাউণ্টব্যাটেনের প্ল্যান গ্রহণ করে। দেশ ও প্রদেশ ভাগ হয়ে যায়। কংগ্রেস তার অংশে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা পায়, লীগও তার অংশে। এর পরে স্বাধীনভাবে সংবিধান রচনা করা হয়। ভারত রাষ্ট্রের সংবিধানে গ্রুপ গঠন করার প্রয়োজন ছিল না। যেসব ক্ষমতা গ্রুপগুলিকে ছেড়ে দেবার কথা সেগুলি কেন্দ্রই হাতে রাখে। প্রদেশগুলির ক্ষমতা যথাপূর্ব। দেশীয় রাজ্যগুলির অধিকাংশই ভারতীয় ইউনিয়নভুক্ত হয়। তাদের ক্ষমতাও প্রদেশের অনুরূপ হয়। প্রদেশগুলিকেও দেওয়া হয় স্টেটের মর্যাদা। এ ছাড়া থাকে কতকগুলি ইউনিয়ন

টেরিটরি। তারা কেন্দ্রের দ্বারা শাসিত। রাষ্ট্রের মূলনীতি হয় ধর্মনিরপেক্ষতা। সুতরাং একই রাষ্ট্রে মুসলিমপ্রধান, খ্রীস্টানপ্রধান ও বৌদ্ধপ্রধান, রাজ্যও থাকতে পারে। সে সময় শিখপ্রধান রাষ্ট্র ছিল না। পরে পূর্ব পাঞ্জাবকে কেটে কুটে শিখ-প্রধান করা হয়।

দেশভাগ তথা প্রদেশভাগ কি কোনো মতেই নিবারণ করা যেত না? যেত বইকি, কোনো পক্ষই সেটা চায়নি। না কংগ্রেস, না ইংরেজ, না মুসলিম লীগ। কিন্তু তার জন্যে দরকার ছিল ১৯১৬ সালের মতো আর-একটা কংগ্রেস লীগ চুক্তি। সেটা না হলে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে চুক্তি হতো না। চুক্তি না হলে ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে যেত ঠিকই, কিন্তু গৃহযুদ্ধ বেধে গেলে তারা বাইরে থেকে মুসলিম লীগকে মদত দিত। সমুদ্রপথেই তারা এসেছিল, সমুদ্রপথেই আবার আসত। কারো সঙ্গে কোনো রকম চুক্তি না করেই স্বাধীনতা পাব এটা ছিল একটা স্বপ্ন। স্বপ্নে আর বাস্তবে অনেক তফাৎ। মুসলিম সম্প্রদায়কে একটা ভাগ দিতে হতোই, সেটা যেভাবেই হোক। জিন্না সাহেব পাকিস্তান চাইতেন না, যদি মুসলিম লীগকে অন্যভাবে একটা ভাগ দেওয়া হতো। কংগ্রেস নেতারা অন্যভাবে দিতে রাজীও হয়েছিলেন. কিন্তু তিন-চতুর্থাংশের সঙ্গে এক-তৃতীয়াংশের নিক্তির ওজনে সমতা ইতিহাসে কেউ কোথাও দেখেনি। সেটাও একটা অবাস্তব সমাধান। স্বাধীনতার জন্যে অত বড়ো দাম দিতে হিন্দু সম্প্রদায় রাজী হতো না। তার চেয়ে দেশভাগ শ্রেয়, যদি সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশভাগও হয়ে যায়। জিন্না সাহেবের প্রদেশভাগে আপত্তি ছিল, কিন্তু মাউন্টব্যাটেন সে আপত্তি খারিজ করেন। মাউন্টব্যাটেন ভিন্ন আর কোনো বড়লাটের সে ক্ষমতা ছিল না। অন্যান্য বড়লাটরা দীর্ঘকাল ভারতে থেকে দেশের লোকের মতিগতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। মাউন্টব্যাটেন নবাগত। তিনি ভাবতেই পারেননি যে পাঞ্জাবে আগুন জ্বলবে। জ্বালাবে শিখরাই আগে। লাহোর হারিয়ে তারা তেমনি উন্মাদ হয়, যেমন হতো কলকাতা হারিয়ে বাঙালী হিন্দু। পদ্মাপারে ওরাও তার বদলা নিত।

শিখদের একাংশের দাবী ছিল খালিস্থান। পাকিস্তান যদি সম্ভব হয় খালিস্থান সম্ভব হবে না কেন? মাউন্টব্যাটেন পারলে খালিস্থানও দিতেন। কিন্তু এমন একটি জেলাও ছিল না যেখানে শিখরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সর্বত্র তারা সংখ্যালঘু। তাদের খালিস্থান দিলে একে তো হিন্দু বা মুসলমানকে বা উভয়কে জোর করে সরাতে হতো, তা ছাড়া পার্টিশনের মূলসূত্রটাই লংঘন করা হতো। মূলসূত্রটা ছিল যার

যেখানে মেজরিটি তাকে সেই জেলা বা অঞ্চল বা প্রদেশ দেওয়া। ব্যতিক্রম কেবল মুর্শিদাবাদ খুলনা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম। এসব জায়গায় ভূগোলের দাবী মানতে হয়।

পশ্চিম পাঞ্জাব হারিয়ে শিখরা চলে আসে পূর্ব পাঞ্জাব ও দিল্লীতে। তার ফলে কয়েকটি জেলায় তারাই হয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। তখন তারা পাঞ্জাবী ভাষাকে ভিত্তি করে আলাদা একটা রাজ্য পায়। সেখানে তারা সংখ্যায় শতকরা বাহান্ন। রাজধানী হিসাবে তারা আশা করেছিল গোটা চণ্ডিগড় পাবে। কিন্তু হরিয়ানা রাজ্যের তাতে আপত্তি থাকায় চণ্ডিগড় হয় ইউনিয়ন টেরিটরি। সেখানে দুই রাজধানী পাঞ্জাবের ও হরিয়ানার। ইতিমধ্যে 'পূর্ব' কাটা গেছে। শিখদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে তারা গোটা চণ্ডিগড়ই পাবে, যদি ফাজিলকা হরিয়ানাকে দেয়। সেটা নিঃশর্ত প্রতিশ্রুতি নয়। কিন্তু অকালী শিখ নেতারা ফাজিলকা হাতছাড়া না করেই হরিয়ানাকে চণ্ডিগড় থেকে বঞ্চিত করতে চান।

আরো কয়েকটা বিতর্কিত বিষয় আছে। যেমন নদীর জলবণ্টন। কিন্তু তলে তলে কাজ করছে খালিস্থানের অচরিতার্থ বাসনা। মুসলমানরা যদি পাকিস্তান পায় শিখরা কেন খালিস্থান পাবে না? এখন তো তারা একটি রাজ্যে সংখ্যাগুরু। মুসলমানদের মতো তারাও তো একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। হিন্দুদের সঙ্গে তাদের মিল যেমন আছে অমিলও তেমনি। তারা দেবদেবী মানে না, মূর্তিপূজা করে না, তাদের শাস্ত্র হিন্দুদের শাস্ত্র নয়, হিন্দুদের শাস্ত্র তাদের শাস্ত্র নয়। ইংরেজরা তাদের স্বতন্ত্র নির্বাচনপদ্ধতি দিয়েছিল, অতিরিক্ত ওয়েটেজ দিয়েছিল। চাকরি বাকরিতেও তারা ওয়েটেজ ভোগ করেছে। সৈন্যদলের তো কথাই নেই। মিলিটারি বাজেটের একটা মোটা অংশই তাদের ভাগে পড়ত। নতুন সংবিধান স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি আর ওয়েটেজ তুলে দিয়েছে। সৈন্যদলেও ধর্ম দেখে নিয়োগ করা হয় না, গুণ দেখে হয়। সব রাজ্যের ও সব সম্প্রদায়ের যুবকেরা সুযোগ পায়। প্রতিযোগিতায় শিখরা কখনো জেতে, কখনো হারে। অসামরিক সার্ভিসগুলিতেও তাই। ফলে শিখদের মধ্যে অসন্তোষ। অপরপক্ষে ব্যবসাক্ষেত্রে শিখরা অপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। হোটেল ব্যবসায় টাটার উপর টেক্কা দিচ্ছেন ওবেরায়। দেশে বিদেশে তাঁর হোটেলগুলি ছড়ানো। যেন একটা হোটেল সাম্রাজ্য। বেশীর ভাগ শিখই খালিস্থানের বিপক্ষে। কিন্তু হলে হবে কী, ধর্মান্ধ শিখও আছে। তারা মরতেও জানে, মারতেও জানে। পুলিশ যদি তাদের আয়ত্তে রাখতে না পারে, সৈন্য পাঠাতে হবে। সৈন্যরাও যদি না পারে তবে বাধ্য হয়ে নতিস্বীকার

করতে হবে। সময় থাকতে একটা রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বার করতে হবে। সন্ত লঙ্গোওয়াল তেমন একটা সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কেন্দ্রের হাতে থাকবে কেবল প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, যোগাযোগ ও অর্থ দফতর। বাদ বাকী দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। সংবিধান সংশোধন না করে এটা হতে পারে না। এই মর্মে সংশোধন করলে প্রত্যেকটি রাজ্য তার সুযোগ নেবে। কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হবেই।

আলীবর্দী খাঁন্ নবাব হবার পর বাদশাহকে প্রচুর নজর পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেই একবারই। তার পরে ষোল বছর তিনি আর রাজস্ব পাঠাননি। তিনি সোভরেনের মতো ব্যবহার করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী সিরাজউদ্দলা তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। বাদশাহ যদি রাজস্ব না পান সৈন্যদের বেতন দেবেন কী করে? গুলীগোলা কিনবেন কী দিয়ে? বাংলা, বিহার, ওড়িশা রক্ষার জন্যে সৈন্য পাঠাবেন কী রসদ কিনে? সময়মতো সৈন্য পাঠালে বাদশাহী ফৌজ এসে ইংরেজ ফৌজের সঙ্গে পলাশীতে লড়তে পারত। ক্লাইভ হেরে যেতে পারতেন। সোভরেন যিনি হবেন তাঁর যদি দেশরক্ষার মুরোদ না থাকে তিনি তো যুদ্ধে হারবেনই। "মজালি কনক লঙ্কা মজিলি আপনি" সিরাজের বেলাও সত্য। ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল করলে একই পরিণাম হবে। এক এক করে প্রত্যেকটি রাজ্য নিজে মজবে ও সারা ভারতকে মজাবে।

শিখরা নাকি একাই একটা 'নেশন'। আর যেহেতু তারা 'নেশন' সেহেতু তারা 'সোভরেন'। শুনে অবাক হতে হয়। কিন্তু ওরা যা বলছে অসমীয়ারাও তাই বলছে। অসমীয়ারাও নাকি একটা 'নেশন'। তারাও নাকি 'সোভরেন'। শুনে তো আমি হতভম্ব। এর পরে আসছে তেলুগুদের পালা। ওরা ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিয়েছে 'তেলুগু দেশম্' নামক পার্টিকে। আগে ওরা আদায় করেছিল 'অন্ধ্রপ্রদেশ'। এবার দেখা যাচ্ছে 'প্রদেশ' পেয়ে তাদের মন ভরেনি। এবার চায় 'দেশ'। এর পরে চাইবে 'সোভরেন নেশন'। বাদশাহী আমলে হায়দরাবাদের নিজামও 'সোভরেন' হতে চেয়েছিলেন, তাঁর সামরিক শক্তিও ছিল। সেকালে 'নেশন' কথাটার চল ছিল না। নিজামের প্রজাদের কতক ছিল তেলুগুভাষী, কতক মরাঠীভাষী, কতক কন্নড়ভাষী। ওরাও একমত হয়ে 'নেশন' বলে দাবী করত না।

আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান থেকে বলতে পারি জবাহরলাল ও রাধাকৃষ্ণন্ ভাষাভিত্তিক

রাজ্যের বিপক্ষে ছিলেন। তাঁরা ছিলেন আমাদের পি. ই. এন সংস্থার সভাপতি ও উপসভাপতি। আমি যখন প্রস্তাব করি যে বিভিন্ন রাজ্যে আমাদের সংস্থার বিভিন্ন শাখা হোক ও সেসব হোক ভাষাভিত্তিক তাঁরা ভয় করেন যে তাতে ভাষাভিত্তিক রাজ্যের দাবী জোর পাবে। আমার প্রস্তাব বানচাল হয়ে যায়। দিল্লীর সাহিত্য আকাদমিরও তাঁরাই ছিলেন সভাপতি ও উপসভাপতি। আমি ছিলুম পরিষদ্ ও সংসদের সভ্য। যখন বলি বিভিন্ন ভাষার জন্যে আকাদমির বিভিন্ন শাখা হোক তাঁরা সে প্রস্তাবও বাতিল করেন। কারণটা একই। ভারত খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। শ্রীরামুলুর অনশনে দেহত্যাগের পর জবাহরলালকে নতিস্বীকার করতে হয়। অন্য উপায় না দেখে তাঁকে মাদ্রাজ রাজ্য ভেঙে 'অন্ধ্র' গঠন করতে হয়। পরে হায়দরাবাদ রাজ্য ভেঙে তার সঙ্গে তেলুগুভাষী অঞ্চল জুড়ে দেওয়া হয়। তখন তার নাম রাখা হয় 'অন্ধ্রপ্রদেশ'। নির্বাচনে জিতে 'তেলুগু দেশম্' দলের কর্তারা এখন রাজ্য সরকারের হাতে আরো ক্ষমতা চাইছেন। তামিলনাড়ু ও কর্নাটকের শাসকদলের দলপতিরা তাঁদের সঙ্গে জোটবন্দী হচ্ছেন। উদ্দেশ্য আরো কিছু ক্ষমতা আদায়। এদিকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলও পেছিয়ে নেই। তবে এখন পর্যন্ত 'নেশন' ও 'সোভরেন' শব্দ দুটি শোনা যায়নি।

এক একটি দেশে এক একটি নেশনই থাকে, একাধিক নেশন থাকে না। স্বাধীন ভারত যদি একটি দেশ হয়ে থাকে তবে এতে একটিমাত্র নেশন আছে, তার নাম ভারতীয় নেশন। তাই যদি হয় তবে শিখরাও আলাদা একটি নেশন নয়, অসমীয়ারাও নয়, তেলুগুরাও নয়। তাদের বাসভূমি 'রাজ্য' হতে পারে, 'রাষ্ট্র' হতে পারে না। যদি হয় তবে ভারতরাষ্ট্রে ভাঙন ধরবে। ভারত হবে ইউরোপের মতো বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত। কোনোটি ধর্মভিত্তিক, কোনোটি ভাষাভিত্তিক, কোনোটি মতবাদভিত্তিক। ইউরোপে যেটা নেই ভারতে সেটা আছে, একটা কেন্দ্রীয় সরকার। এটা যদি ভেঙে যায় তো ভারতও বিভক্ত হবে বহুসংখ্যক রাষ্ট্রে। কোনোটা ধর্মভিত্তিক, যেমন পাঞ্জাব। কোনোটা ভাষাভিত্তিক, যেমন তেলুগুদেশ। কোনোটা মতবাদভিত্তিক, যেমন পশ্চিমবঙ্গ। অনেকে হয়তো বলবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। ভারতের ইতিহাসে কেন্দ্রীয় শাসন বেশীদিন টিকতে পারেনি। না মৌর্য শাসন, না গুপ্ত শাসন, না মোগল শাসন, না ব্রিটিশ শাসন। কংগ্রেস শাসনও একই পথে যাবে। বিরোধীপক্ষের শাসনও। বলকানীকরণের সম্ভাবনা অমূলক নয়। এসব তারই পূর্বাভাস। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন করার সময় ভাবা উচিত ছিল যে রাজ্য একদিন রাষ্ট্র হতে চাইতে পারে,

ভাষাভিত্তিক জাতি একদিন নেশন বলে পরিচয় দিতে পারে। এখন তো দেখা যাচ্ছে ভাষাগোষ্ঠীর নাম করে যে রাজ্য গঠন করা হলো সেখানে একটি ধর্মরাষ্ট্র স্থাপন করার উদ্যোগ চলেছে। দাঙ্গাহাঙ্গামা করে পাকিস্তান অর্জন, অনশনে প্রাণ দিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ অর্জন, এর পরে কি সিপাহীবিদ্রোহ বাধিয়ে খালিস্থান অর্জন?

মানতেই হবে যে পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মালব, অন্ধ্র, কর্নাটক, তামিলনাডু, কেরল, উৎকল, বঙ্গ, আসামের ইতিহাস বরাবরই স্বতন্ত্র। অতীতের সঙ্গে এরা মনে মনে অন্বয় রক্ষা করে এসেছে। এরা যত না ভারতীয় তার চেয়ে বেশী বাঙালী বা অসমীয়া বা ওড়িয়া বা তেলুগু বা তামিল বা মরাঠা বা গুজরাটী। ব্রিটিশ আমলের আগে এটাই ছিল স্বাদেশিকতা, পরে হয় প্রাদেশিকতা। এখন এর নাম কী? আঞ্চলিকতা? নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলা সাহিত্যকে আঞ্চলিক সাহিত্য বললে খাটো করা হয়। পদ্মার ওপারে এই বাংলা সাহিত্যই জাতীয় সাহিত্য। এ ভাষায় ইউনাইটেড নেশনসে বক্তৃতা দিয়েছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। সব দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসে এই ভাষাই ব্যবহৃত হয়। ইউরোপের উপর দিয়ে যাতায়াতের সময় বিমানের ভিতরে ও বাইরে বিভিন্ন অবতোরণস্থলে বা আরোহণস্থলে বিমানযাত্রীদের এই ভাষাতেই বার্তা শোনানো হয়।

এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্টেটাসের প্রশ্ন তথা আইডেনটিটির প্রশ্ন। ভারতের বাঙালীরা আর পাঞ্জাবীভাষী শিখরা এটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একবার আমাকে বলেছিলেন, "জানেন, ভারতীয় দূতাবাসে হিন্দী ছাড়া আর কোনো ভারতীয় ভাষার পত্রিকা রাখে না? বিদেশীরা আর কোনো ভাষার কথা জানতে পায় না?" হিন্দীকে অত বেশী প্রাধান্য দিলে তার প্রতিক্রিয়া সংহতি বিপন্ন করবে, তার লক্ষণ স্পষ্ট। রাজনৈতিক সমাধানের কথা চিন্তা করতে হবে।

গান্ধী জীবিত থাকলে বোধ হয় সন্ত লঙ্গোয়ালকে সমর্থন করতেন। তিনিও কেন্দ্রকে এত বেশী ক্ষমতা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। বিকেন্দ্রীকরণই ছিল তাঁর আদর্শ। কংগ্রেস নেতারা কিন্তু তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন না। আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা পিতাদেরও আদর্শ ছিল বিকেন্দ্রীকরণ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা বেড়েছে। তবে তিনি যতই শক্তিশালী হোন না কেন, ক্ষুদ্রতম অঙ্গরাজ্যের উপর রাষ্ট্রপতি শাসন চাপিয়ে দিতে পারবেন না। যেটা এদেশে বার বার হয়েছে ও প্রত্যেকটি রাজ্যের উপর খাঁড়ার মতো ঝুলছে। সব জেনেশুনেও অনেকে এদেশে প্রেসিডেনশিয়াল সীস্টেম প্রবর্তন করতে চান। যেহেতু রাষ্ট্রপতি দ্য গল সেটা ফ্রান্সে

প্রবর্তন করে গেছেন। খেয়াল রাখেননি যে একদিন তার সুযোগ নেবেন বিপরীত মতবাদী মিতের। প্রধানমন্ত্রীকে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়ে সরানো যায়, কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে সরানো ঢের বেশী কঠিন। ফ্রান্সে ভারতের মতো অঙ্গরাজ্য নেই। থাকলে দ্য গলের পক্ষে প্রেসিডেনশিয়াল সীস্টেম প্রবর্তন করা অত সহজ হতো না। হিটলার সেটা করেছিলেন গায়ের জোরে। আইনের জোরে নয়। ভোটের জোরে নয়। ওটাকে একটা সীস্টেম বলা চলে না। হিটলারও গেছেন, পশ্চিম জার্মানীতে কেন্দ্রীকরণও গেছে।

প্রয়োজন হলে ক্ষমতার পুনর্বণ্টন করতে হবে। যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। তা বলে আলীবর্দি খানের মতো নবাবের সুবিধার জন্যে নয়। আলীবর্দি কি জানতেন যে তাঁর উত্তরাধিকরী সঙ্কটকালে বাদশাহের সাহায্য না পেয়ে যুদ্ধে হারবেন? ভারতের রাষ্ট্রপতির বা প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য না পেলে পশ্চিমবঙ্গে আবার সে রকম ব্যাপার ঘটতে পারে। অতিমাত্রায় কেন্দ্রীকরণ যেমন ভয়াবহ অতিমাত্রায় বিকেন্দ্রীকরণও তেমনি। পরিমিত ক্ষমতার উপর আরো কিছু ক্ষমতা বাড়িয়ে নিতে পারো, কিন্তু বাদশাহী আমলের পুনরাবৃত্তি করে নয়। সম্প্রতি আমার হাতে পড়েছে সমসাময়িক ঐতিহাসিক য়ুসুফ আলী খানের ফার্সী কেতাব 'তারিখ-ই বাঙ্গালা-ই মহাবতজঙ্গী' গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ। অনুবাদক মৌলানা আজাদ কলেজের অধ্যাপক ডক্টর আবদুস সুভান। কলকাতা জয় করে সিরাজউদ্দৌলা একটি ক্ষুদ্র কক্ষে শতখানেক ফিরিঙ্গীকে অবরুদ্ধ করেন। প্রায় সব কজনই দম বন্ধ হয়ে মারা যায়। এটা সিরাজের ইচ্ছাকৃত নয়। অধীনস্থ কর্মচারীর অজ্ঞতার ফল। একবছরের মধ্যেই ইংরেজরা পলাশীতে প্রতিফল দেয়। অন্ধকূপ হত্যা না ঘটলে পলাশীও ঘটত না। কলকাতা বিজয়ই নবাবের কাল হলো। অন্ধকূপ হত্যাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়ে লাভ নেই। এ গ্রন্থের বাংলা তর্জমা হওয়া উচিত।

মাথার উপর কেন্দ্রীয় সরকার না থাকলে কী হয় তা তো আমরা পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে দেখছি। গায়ের জোরে ক্ষমতা দখল করেছেন দু'দিকে দু'জন সেনাপতি। গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবার লেশমাত্র ইচ্ছা নেই। গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামে বহু লোককে প্রাণ বিসর্জন করতে হবে। এর কোনো দরকারই হতো না যদি ওরা একই ফেডারল গভর্নমেণ্টের সামিল হয়ে থাকত। সে গভর্নমেণ্টে তাদেরও প্রতিনিধি থাকতেন। ভারতীয় ইউনিয়নকেও দ্ব্যর্থহীন ভাবে ফেডারশনে রূপান্তরিত করতে হবে। সেটা এই ছত্রিশ বছরেও সম্ভব হয়নি। আমরা আশা করব যে অবিলম্বে সম্ভব হবে।

বিচ্ছিন্ন হবার দাবী

'বিচ্ছিন্নতা' কথাটি ইতিপূর্বে 'এলিয়েনেশন' প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। ঐ একই শব্দ এখন 'সিসেসন' প্রসঙ্গে ব্যবহার করা কি সঙ্গত? তাই আমি একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখছি 'বিচ্ছিন্ন হবার দাবী'?

ছেলেবেলায় আমরা পড়েছি ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস ও আয়ারল্যাণ্ড মিলে একটাই রাজ্য। তার রাজা পঞ্চম জর্জ। বড়ো হয়ে দেখলুম আয়ারল্যাণ্ডের তিন-ভাগের উপর আলাদা হয়ে গেছে। রাজার উপাধি কিং অব গ্রেট ব্রিটেন অ্যাণ্ড নর্দার্ন আয়ারল্যাণ্ড। সম্প্রতি স্কটল্যাণ্ড থেকে আলাদা হয়ে যাবার দাবী উঠেছে, কিন্তু স্কটদের মধ্যেই দুই মত। একমত হলে ওরাও আলাদা হয়ে যেতে পারে। ওয়েলসেও অনুরূপ আন্দোলন চলেছে। কিন্তু ওইটুকু দেশ আলাদা হয়ে গেলে মুশকিলে পড়বে। নর্দার্ন আয়ারল্যাণ্ডে গোলমাল চলছে। ক্যাথলিক মাইনরিটি চায় অখণ্ড আয়ারল্যাণ্ড। প্রটেস্টাণ্ট মেজরিটি নারাজ। অখণ্ড আয়ারল্যাণ্ডে তারা মাইনরিটি। দু'পক্ষের ঝগড়া কিছুতেই মিটছে না। পাহারা দিচ্ছে ব্রিটিশ আর্মি। কতদিন দেবে কে জানে! আধুনিক পাশ্চাত্য দেশে ও ধর্ম অনুসারে রাজ্য ভাগ হয়।

বেলজিয়ামের সৃষ্টি হয়েছিল নেদারল্যাণ্ডস যখন ধর্ম অনুসারে ভাগ হয়ে যায়। প্রটেস্টাণ্টদের দেশ হয় হলাণ্ড আর ক্যাথলিকদের দেশ বেলজিয়াম। এখন বেল-জিয়ামের ক্যাথলিকদের মধ্যেই ভাষা অনুসারে ভাগের দাবী উঠেছে। ফ্লেমিশ যাদের মাতৃভাষা আর ফ্রেঞ্চ যাদের মাতৃভাষা তারা বাস করে স্বতন্ত্র অঞ্চলে। যে যার অঞ্চলকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাইছে। পারছে না এইজন্যে যে রাজধানী ব্রাসেলস নিয়ে মীমাংসা হচ্ছে না। দু'পক্ষই ওটা দাবী করছে। শহরটাকে দু'ভাগ করাও সম্ভব নয়।

কানাডার ফরাসীভাষী প্রদেশ কুইবেক অন্যান্য প্রদেশের থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হবে, এটা যাদের দাবী তারা স্বভাষীদের কাছেই ভোটে হেরে গেছে। স্বভাষীরা সবাই যদি একমত হতো তা হলে কুইবেকও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হতে পারত। কানাডা

বলতে তখন বোঝাত কুইবেকবিহীন কানাডা। এখন যেমন ভারত বলতে বোঝায় পাকিস্তানবিহীন ও বাংলাদেশবিহীন ভারত। ফরাসীভাষী কুইবেককে সন্তুষ্ট করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদা তৎপর। কিন্তু মাইনরিটি কি কখনো মেজরিটির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে? কানাডার এক ফরাসীভাষী উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। ইংরেজীপ্রাধান্য তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারছিলেন না। অথচ কুইবেক স্বাধীন হোক এটাতেও তাঁর সায় ছিল না। ওইটুকু প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে সমৃদ্ধিশালী হবে কী করে? সামরিক শক্তিই বা পাবে কোথায়?

গত শতাব্দীতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দাস ব্যবসায়ের প্রশ্নে দু' ভাগ হয়ে গৃহযুদ্ধে জর্জর হয়। উত্তরের বাহুবল দক্ষিণের বাহুবলকে পরাস্ত করে। সমাধান যেটা হয় সেটা সামরিক সমাধান। দক্ষিণের লোক এখনো সেটা ভুলে যায়নি। পরাজয় কেউ কখনো ভোলে না। তবে সবাই এখন স্বীকার করেছে যে একসঙ্গে থাকার ফলে সকলের সমৃদ্ধি বেড়েছে, শক্তি বেড়েছে। তা না হলে দুই পক্ষেরই অবস্থা খারাপ হতো।

এটা কে না বোঝে যে ভারত অখণ্ড থাকলে হিন্দুমুসলমান সকলেরই সমৃদ্ধি বাড়ত, শক্তি বাড়ত? কিন্তু বুঝলে কী হবে, ধর্ম অনুসারে রাষ্ট্রগঠনের মূলে ছিল মেজরিটির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারার সামর্থ্য! মুসলমানরা প্রতিযোগিতায় সফল হতে পারছিল না। সর্বক্ষেত্রেই তাদের স্থান ছিল নিচের দিকে। এক সৈন্যদল বাদে। গৃহযুদ্ধ বাধলে তাদের হারিয়ে দেওয়া শুধুমাত্র সংখ্যার জোরে সম্ভব হতো না। তাই নেতারা অত সহজে দেশভাগে রাজী হয়ে যান।

ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বেধে যায় ভাষা নিয়ে দ্বন্দ্ব। কেন্দ্রের সরকারী ভাষা হবে উর্দু ও একমাত্র উর্দু এটা যাদের ফতোয়া তারা সংখ্যাগুরু বাংলাভাষীদের প্রাণে আঘাত দেয়। পরে দুই ভাষার মধ্যে সমতা স্বীকৃত হলেও কার্যত বাংলাভাষীদের স্বার্থহানি হয়। তারা ছয় দফা দাবী তোলে। সেসব দাবী মেনে নিলে কেন্দ্র দুর্বল হয়। অথচ তার বদলে কেন্দ্রীয় শাসনে বাংলা-ভাষীদের সংখ্যাগুরু হতে দেওয়া হয় না। সামরিক শাসন প্রকারান্তরে সংখ্যালঘুর শাসন। এই জট খোলার আর কোনো উপায় নেই দেখে পূর্ব পাকিস্তান জট কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার নতুন নাম হয় বাংলাদেশ। তার ভিত্তি হয় ভাষা। ধর্ম নয়। ধর্মের প্রশ্নে যারা এক হয়েছিল ভাষার প্রশ্নে তারা দুই হয়ে যায়।

এদিকেও হিন্দুর সংখ্যাগুরুত্বকে আচ্ছন্ন করছে হিন্দীর তথাকথিত সংখ্যাগুরুত্ব। কিন্তু ভাষার প্রশ্নে ভারত যে ভেঙে যায়নি তার কারণ হিন্দীর প্রতিদ্বন্দ্বী এদেশে

বাংলা প্রভৃতি নয়, একমাত্র ইংরেজীই তার দোসর ও কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি বাকরিতে ইংরেজীর কদর এখনো অব্যাহত। ইংরেজীর সাহায্যে আমরা ভাষাভিত্তিক বিচ্ছিন্নতা ঠেকিয়ে রেখেছি।

ধর্ম অনুসারে দেশ ভাগ দ্বিতীয়বার হবে না। সংখ্যালঘু হলেও শিখরা তা চায় না। খ্রীস্টানরা তা চায় না। মুসলমানরাও সবাই যে চেয়েছিল তা নয়। সবাই যদি চাইত তবে কাশ্মীরও আলাদা হয়ে যেত। আপাতত আমাদের সমস্যা ধর্ম নিয়ে নয়, ভাষা নিয়ে। হিন্দীর দাপটে তামিল একদিন বিদ্রোহী হতে পারে। সেটা দেশদ্রোহ নয়, হিন্দীভাষীদের প্রাধান্যের বিরোধিতা। কিন্তু এই মুহূর্তে যেটা প্রত্যক্ষ সেটা ভারতের উত্তর পূর্ব প্রান্তে অসমীয়াভাষীদের বিদ্রোহ। এটাও দেশদ্রোহ নয়। ওদের দাবী বিদেশী নাগরিকদের বহিষ্কার। অন্তত ভোটার তালিকা থেকে তাদের বর্জন। কিন্তু দাবী আদায় করার জন্যে যে পদ্ধতি তারা অবলম্বন করেছে সেটা ভারত সরকারের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম। সরকার যদি আসাম থেকে তেল উদ্ধার করতে না পারে, সে কাজে নিযুক্ত কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তাদের একজনকে ঢিল মেরে খুন করা হলেও কাউকে সাজা দিতে না পারে তবে সরকারের সমস্ত প্রেস্টিজ ও সমস্ত অথরিটি ধূলিসাৎ হয়। এ সরকার ব্যর্থ হলে আর কোনো সরকার সফল হবে না। তখন আসাম ইচ্ছা করলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারবে। তবে তেমন ইচ্ছা অসমীয়াদের অধিকাংশের আছে কি না সন্দেহ। কুইবেকের মতো রেফারেণ্ডাম হলে হয়তো তারা বিচ্ছিন্নতার বিপক্ষেই ভোট দেবে। কিন্তু যদি স্বপক্ষে দেয়?

অসমীয়াদের মনের ভিতরে যে ভাবাবেগ ঘনীভূত হচ্ছে সেটা ভারতবিরোধী নয়, সেটা ভিন্নভাষাবিরোধী। ওরা শুধু যে বিদেশী বলে বাংলাদেশের শরণার্থী হিন্দু তথা চাষী মুসলমানদের অবাধ অনুপ্রবেশের বিরোধী তা নয়, বহিরাগত বলে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের থেকে আগত সরকারী কর্মচারী, পাবলিক সেকটরের কর্মী, ব্যবসাদার, চা বাগানের শ্রমিক প্রভৃতির অবাধ প্রবেশেরও বিরোধী। এর পেছনে আছে নিজেদের সংখ্যাধিক্য হারাবার ভীতি। এদের প্রবেশ নিরোধ করতে হলে এমন সব আইন পাশ করিয়ে নিতে হয় যা রাজ্য বিধানসভার ক্ষমতার বাইরে। তা হলে লোকসভাকে বলতে হয় সংবিধান সংশোধন করতে। লোকসভা যদি সেটা করে তো অন্যান্য রাজ্য থেকেও ভিন্নভাষীদের বিরুদ্ধে আইন পাশ করার ধুম পড়ে যাবে। ভারত খণ্ড খণ্ড হতে কতক্ষণ? কোনো কেন্দ্রীয় সরকার কি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, মণিপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতির বিচ্ছিন্নতার দাবীও ক্রমে ক্রমে উঠছে। সেটা কিন্তু ভাষাঘটিত নয়। 'রেস' অর্থে জাতিঘটিত। দুই পক্ষই যেখানে হিন্দু সেখানেও তথাকথিত আর্য-অনার্যের ভেদ আছে। যেমন ত্রিপুরায়, মণিপুরে। ধর্ম একে ধামাচাপা দিয়েছে, যেমন খ্রীস্টান ধর্ম দক্ষিণ আফ্রিকায়। কিন্তু আজকের দিনে যে যার অধিকার সচেতন হয়েছে। কৃষ্ণাঙ্গরা দাবী করছে শ্বেতাঙ্গদের সমান অধিকার। তোমার যদি একটি ভোট থাকে তো আমারও একটি ভোট থাকবে। ভোটের জোরে তুমি যদি সরকার গঠন করতে পারো তো আমিও পারব সরকার গঠন করতে। তুমি যদি আইন পাশ করতে পারো তো আমিও পারব আইন পাশ করতে। এখানে শ্বেতাঙ্গদের ঘোর আপত্তি। তারা নিজেরা গণতন্ত্রী হয়েও অপরকে গণতান্ত্রিক অধিকার দেবে না। বিরোধ অনিবার্য। দীর্ঘ সংগ্রামের দ্বারা রোডেশিয়ার কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের অধিকার আদায় করে নিয়েছে। আরো দীর্ঘ সংগ্রামের পর দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গরাও তাদের অধিকার আদায় করে নেবে। মনে রাখতে হবে যে তারা ইতিমধ্যেই খ্রীস্টধর্ম ও ইউরোপীয় সভ্যতা গ্রহণ করে শ্বেতাঙ্গদের কাছাকাছি এসেছে। এর জন্যে যা ত্যাগ করতে হয়েছে তার বেশী ত্যাগ করা সম্ভব নয়।

এদেশের তথাকথিত অনার্যরাও হিন্দু ধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতা গ্রহণ করেছে। তার জন্যে এত বেশী ত্যাগ স্বীকার করেছে যে তার বেশী আশা করা অন্যায়। তাদের যদি সঙ্গে রাখতে হয় তো তাদের মৌলিক অধিকারগুলো মেনে নিতে হবে। তাদের সংখ্যাগত গুরুত্ব কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। তাদের জায়গা জমি তাদেরই থাকবে। তাদের বনজঙ্গল উজাড় করা চলবে না। তারা যেখানে সংখ্যাধিক সেখানে তারাই সরকার গঠন করবে। বাইরে থেকে শরণার্থীরা উড়ে এসে জুড়ে বসবে না। সংখ্যাগুরুকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করবে না। তা যদি হয় তো তারা কোনোকালেই মাথা তুলতে পারবে না। তাদের বিদ্রোহ স্বাভাবিক। তারা যদি বিচ্ছিন্নতার দাবী তোলে সেটাও অস্বাভাবিক নয়।

ত্রিপুরার সমস্যাটা জাতি বা 'রেস' ঘটিত। সুতরাং আরো পুরাতন ও আরো গভীর। একই সমস্যা ধোঁয়াচ্ছে মেঘালয়ে, মণিপুরে, মিজোরামে, নাগাল্যাণ্ডে, অরুণাচলে। ভাষার জন্যে ততটা নয় যতটা জাতি বা 'রেসে'র জন্যে। কোথাও খ্রীস্টধর্ম, কোথাও বা বৌদ্ধধর্ম কাজ করছে। যেসব সমস্যা সনাতন তাদের জন্যে চীন, মার্কিন প্রভৃতি বিদেশী শক্তিকে দোষ দেওয়া বৃথা। আমাদের কর্মফল আমাদেরই

ভোগ করতে হবে। এর কোনো সামরিক সমাধান নেই। রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বার করতে হবে। নয়তো বিচ্ছেদের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। ইউনিয়ন মানে জোড়াতালি নয়। জাতীয় ঐক্যের জন্যে অশেষ ত্যাগস্বীকার। যারা হিন্দু নয়, যারা আর্য নয়, যারা আর্যপূর্ব তারাও ভারতীয়। তাদের অগ্রাধিকার মেনে নিতে হবে।

বাতাস যার বীজ ঝড় তার ফসল

রবীন্দ্রনাথের একটি গান আছে— "আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে, তাই আকাশকুসুম করিনু চয়ন হতাশে।" ইংরেজীতে অনুরূপ একটি প্রবচন আছে। এটি বাইবেল থেকে নেওয়া। "যারা বাতাসের বীজ বোনে তারা ঝড়ের ফসল কাটে।" আমাকে একান্ত বেদনার সঙ্গে বলতে হচ্ছে এটাই হচ্ছে এক কথায় আসামের পরিস্থিতি বা পরিণতি। এ ছাড়া আর কিছু হতে পারত না। তবে সময়ে নিবারণ করতে পারা যেত। এখন আর নিবারণ করা যায় না। কিন্তু এইখানেই থামিয়ে দিতে পারা যায়। সেটা পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের সাধ্য নয়।

তবে কি ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর সাধ্য? না, তাঁরও সাধ্য নয়। তিনি নব-প্রতিষ্ঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে চুক্তি-বদ্ধ। মুজিব না থাকলেও চুক্তি আছে। সে চুক্তি এখনো বলবৎ। উভয় রাষ্ট্র সম্মত না হলে তার রদবদল অসম্ভব। ইন্দিরাজী না থাকলেও সেটা থাকবে। কংগ্রেস না থাকলেও সেটা থাকবে। তবে, হ্যাঁ, আসাম যদি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সেটা হয়তো থাকবে না। তখন বাংলাদেশের সামরিক শাসকরা যদি আসাম আক্রমণ করেন ভারত তাকে রক্ষা করতেও পারে, না করতেও পারে। চীন ছুটে আসতে পারে বাংলাদেশকে মদত দিতে। তিন যুধ্যমান রাষ্ট্রের পাল্লায় পড়ে আসামের অস্তিত্বই থাকবে না। সেকালের পোলাণ্ডের মতো ত্রিভঙ্গও হয়ে যেতে পারে।

এটা কবিকল্পনা নয়। ইতিহাসের শিক্ষা। বলা বাহুল্য ভারতেরই ক্ষতি হবে সব চেয়ে বেশী। ভারতই অরুণাচলে, নাগাল্যাণ্ডে, মণিপুরে, মিজোরামে তথা মেঘালয়ে যাবার পথ পাবে না। তারাও ভারতে আসার পথ না পেয়ে বাংলাদেশের বা চীনের আশ্রিত রাজ্য হবে। দুর্বলের স্বাধীনতা অর্থহীন। সেটা নামেই স্বাধীনতা।

তেমন দুর্ভাগ্য এড়ানোর জন্যে ভারতরাষ্ট্র যদি আগে থেকেই আসামকে তিন-ভাগে বিভক্ত করে তিনটি স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করে তা হলে আর কিছু না হোক অরুণাচলে ও মেঘালয়ে যাবার পথ খোলা পাবে। সেই পথে নাগাল্যাণ্ডে, মণিপুরে,

মেঘালয়ে ও মিজোরামে যাবে। ভারতের স্বাধীনতার দিক থেকে এটাই অবশ্য করণীয় ন্যূনতম ব্যবস্থা। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার আগে এটুকু ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক।

দাঙ্গাহাঙ্গামা আসামে আগেও হয়েছে, কিন্তু সেসব দাঙ্গাহাঙ্গামা অসমীয়াতে বাঙালীতে। বলা যেতে পারে দ্বিপাক্ষিক সংগ্রাম। আসাম রাজ্যের নির্বাচিত সরকারই ভারত সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে সেসব দাঙ্গাহাঙ্গামা থামিয়ে দিয়েছেন। এবার কিন্তু সংগ্রামটা কেবলমাত্র অসমীয়াতে বাঙালীতে নয়, এবার এই সংগ্রামে মুসলমান নেমেছে, খ্রীস্টান নেমেছে। এটা সাম্প্রদায়িক মোড় নিয়েছে। সেটা আসামের ইতিহাসে অভূতপূর্ব হলেও ভারতের ইতিহাসে নয়। হিন্দু মুসলমান তো যত্র তত্র লড়ছে। হিন্দু খ্রীস্টানও লড়ছে কুমারিকা অন্তরীপের আশে পাশে। ওদিকে অকালী শিখরাও ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করে বসেছে। ওটা হিন্দু শিখের সংগ্রামে পর্যবসিত হতে পারে। আসামের বর্তমান সংগ্রাম তা হলে ত্রিপাক্ষিক। না, তার চেয়েও বেশী। 'বড়ো' বলে একটি উপজাতি আছে, তাদের কতক খ্রীস্টান হয়েছে। যারা ধর্মান্তর গ্রহণ করেনি তাদের কতক লিপ্যন্তর গ্রহণ করেছে। তারা রোমান লিপিতে লেখে। সে রকম বই আমি উপহার পেয়েছি। তাদের ভাষা স্বতন্ত্র। বোধ হয় তিব্বত-বর্মী ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম। তারাই আজকাল স্বতন্ত্র রাজ্য উদয়াচল দাবী করছে। সম্প্রতি তারা অসমীয়া হিন্দু নিপাত করে। আর লালুংরা বাঙালী মুসলিম নিপাত।

উপজাতীয়রা যোগ দেওয়ায় সংগ্রামটা হয়ে দাঁড়ায় চতুষ্পাক্ষিক। চার পক্ষের নাম অসমীয়া, বাঙালী, মুসলমান, উপজাতি। আসাম পুলিশ অসহযোগী হওয়ায় সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশকে ডাকতে হয়। তারাও হালে পানী পায় না বলে ভারতের সৈনিকদের ডাক দেওয়া হয়। ভারত সরকারও পক্ষভুক্ত হন। তখন সংগ্রামটার রূপ হয় পঞ্চপাক্ষিক। কিন্তু এমন জটিল সমস্যার কোনো সামরিক সমাধান নেই। রাজনৈতিক সমাধানই শ্রেয়। সেটা সম্ভব হচ্ছে কী করে যদি ছাত্র সঙ্ঘ ও গণসংগ্রাম পরিষদ জেদ ধরে বসে থাকে যে শেখ মুজিবের সঙ্গে চুক্তির খেলাপ করে ১৯৬১ সালের পরে যারা এসেছে তাদেরকেও বিদেশী নাগরিক বলে বাংলাদেশে ফেরৎ দিতে হবে, নয়তো ভারতের অন্যান্য রাজ্যে চালান করে অন্যত্র পুনর্বাসিত করতে হবে? আপাতত ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম কেটে দিয়ে তাদের ভোটদানের অধিকার কেড়ে নিতে হবে। এসব দাবী যেন পরাজিত রাষ্ট্রের কাছে বিজয়ী রাষ্ট্রের দাবী। অসমীয়া আন্দোলনকারীরা যেন যুদ্ধে জিতেছে। ভারত সরকার যেন হেরে গেছেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ধৈর্যের সীমা নেই। আন্দোলনকারীদের উপেক্ষা করলে রাজনৈতিক সমাধান হয় না। তাদের কাছে নতিস্বীকার করলে অন্তত দশলক্ষ নরনারী ও শিশুকে বাস্তুচ্যুত ও সম্পত্তিচ্যুত করা হয়। বাংলাদেশ তাদের ফেরৎ নেবে না, নিলে হাজার কয়েককে নেবে। অন্যান্য রাজ্য তাদের আশ্রয় জোগাতে পারবে না, আশ্রয় দিলেও জমি জোগাতে পারবে না, জীবিকা জোগাতে পারবে না, সম্পত্তির পরিবর্তে সম্পত্তি জোগাতে পারবে না। কিসের ভরসায় তারা অন্যান্য রাজ্যে যাবে? সেখানেও তো দু'দিন পরে রব উঠবে, বিদেশী নাগরিকদের দায়িত্ব আমরাই বা বহন করব কদ্দিন? এদের বিদায় করা হোক। বিদেশী নাগরিক সর্বত্রই বিদেশী নাগরিক। তাদের নাগরিক করে নিলে তারা সেই অধিকারে আবার আসামে ঢুকবে। এবার কেউ আইন অনুসারে আটকাতে পারবে না। তখন কি আভ্যন্তরীণ পাশপোর্ট প্রথা প্রবর্তন করতে হবে?

তারপর ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটাও কি আদালতের বিচারে ধোপে টিকবে? যারা কয়েকবার ভোট দিয়ে এসেছে তাদের ভোটচ্যুত করলে পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলো অসিদ্ধ হয়ে যায়। পূর্ববর্তী বিধানসভাগুলো অবৈধ হয়ে যায়। তাদের পাশ করা আইনগুলো কেঁচে যায়। বাজেটগুলো ও সেই অনুসারে খরচগুলো নিয়ে গণ্ডগোল বাধে। এখনকার এই আপত্তিটা বিশবছর আগে তোলা উচিত ছিল। এটা যেন ছেলেপুলে হবার পর বিবাহ অস্বীকার করা। এমন আপত্তির কথা কেউ কখনো শোনেনি। আসাম কি সৃষ্টিছাড়া দেশ?

আগে ভোটার তালিকা থেকে বিদেশী নাগরিকদের নাম খারিজ করো, তারপরে নির্বাচন হবে, এটাও কি যুক্তিসঙ্গত দাবী? এমন করলে পাঁচবছরেও নির্বাচন হবে না, মাঝখানে নিম্ন আদালত, উচ্চ আদালত, সুপ্রীম কোর্ট। সরকার কি আদালতের ধার ধারবেন না? একদিকে সাধারণ নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে এসেছে, আরেকদিকে রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা তিনবছর ধরে চলে আসছে, সেটা আপাতত স্থগিত রেখে নির্বাচন অনুষ্ঠান করলে ক্ষতি কী? তারপরে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করলে কার কী ক্ষতি? রাজনৈতিক সমাধানে মন্ত্রীদেরও তো হাত থাকতে পারে। তাঁরা যে ইন্দিরা কংগ্রেসের লোক হবেনই তা আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। অপর পক্ষে, রাষ্ট্রপতির শাসন মানে তো ইন্দিরা গান্ধীর মনোনীত রাজ্যপাল ও তাঁর পরামর্শদাতাদের শাসন।

যে রাজ্যের মোট জনসংখ্যা দেড় কোটি সে রাজ্যে দশ লক্ষ বিদেশী নাগরিক

থাকলে তারা মোট জনসংখ্যার শতকরা সাতজন। সেই সাতজন ভোট দিতে পারে বলে কি বাকী তিরানব্বই জনকে ভোটদানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যায়? তারা ভোট দিলে ফলাফলের এমন কী তারতম্য হবে? না দিলেই বা কার কতটুকু লাভ হবে? যেখানে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল আসরে নেমেছে ও উভয়েই সমান বলবান সেখানে একটা ভোটের এদিক ওদিকও নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করতে পারে। এটা সম্ভব, তবে সাধারণত খুব কম জায়গাতেই এমন হয়। তার জন্যে গোটা-কয়েক জায়গায় নির্বাচন বাতিল করে আবার নির্বাচনের ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু বিধানসভার মোট একশো ছাব্বিশটি আসনের প্রত্যেকটির নির্বাচন বন্ধ করতে হবে এ দাবীর পেছনে আছে যুক্তি নয়, জেদ। জেদ থেকে দুনিয়ায় অনেক যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে গেছে। এটাও একপ্রকার কুরুক্ষেত্র বা লঙ্কাকাণ্ড। বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী। বিনা যুদ্ধে নাহি দিব রামের ঘরণী। বিনা যুদ্ধে নাহি দিব ভোট অধিকার। জ্বালাও গ্রাম, পোড়াও বাড়ী, তাড়াও মানুষ, পৃথিবী থেকেই বিলুপ্ত করো। পরলোকে গিয়ে বসতি করুক। এই যে জেদ এর কাছে নতিস্বীকার করা যায় না। শুধুমাত্র ভোট দিতে গেছে বা যাচ্ছে বা যাবে এই অপরাধে বহু লোককে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে, দিয়েছে অসমীয়া জনতা। বদলা নিয়েছে যেখানে যার মেজরিটি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভোটের বদলে পদভোট। পদভোটদাতারা সপরিবারে পশ্চিম-বঙ্গের ত্রাণশিবিরে ভিড় করেছে। তা সত্ত্বেও হস্তভোট দিতে পেরেছে কোথাও শতকরা দশজন, কোথাও বিশজন, কোথাও ত্রিশ চল্লিশজন, কোথাও ষাট-সত্তরজন। কোথাও আরো বেশী। একটাও ভোট পড়েনি এমন কেন্দ্রও আছে। সমস্তটা নির্ভর করেছে ভয় বা সাহসের উপরে। আসামের নির্বাচনে ভোটদানের পক্ষে ও বিপক্ষে জনমত স্পষ্টত দু'ভাগ হয়ে গেছে। পক্ষে যারা তাদের একাংশ নিশ্চয়ই অসমীয়া হিন্দু, মুসলমান ও উপজাতি শ্রেণীভুক্ত। এঁদের ভোটদানের অধিকার এঁরা প্রয়োগ করেছেন। এঁরা প্রধানত ইন্দিরা কংগ্রেসের দলভুক্ত। তা বলে রাজ্যদ্রোহী বা সংবিধানদ্রোহী নন।

"আমরা ভোট দেব না, অতএব তোমাদেরও ভোট দিতে দেব না" এটা ন্যায় নয়, ধর্ম নয়, আইন নয়, সভ্যসমাজের রীতি নয়। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস যখন অসহযোগ নীতি গ্রহণ করে তখন নির্বাচন বয়কটও ছিল তার প্রোগ্রামের একটি ধারা। কংগ্রেস থেকে সবাইকে অনুরোধ করা হয় ভোটদান থেকে বিরত থাকতে। কিন্তু কারো উপর বলপ্রয়োগ করা হয়নি, প্রাণহানির বা গৃহহানির ভয় দেখানো

হয়নি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নিন্দাবাদ করা হয়েছে। ভোট কেন্দ্রে বেশী লোক যান নি বলে ভোটদান বাতিল হয়ে যায়নি। কম লোকের ভোটে আইন সভা গঠিত হয়েছে বলে সেটা ভেঙে দেওয়া হয়নি। সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রী হয়ে তিনবছর কাজ চালান ও কলকাতা করপোরেশন আইন পাশ করে চিত্তরঞ্জনকে মেয়র হতে ও সুভাষচন্দ্রকে চীফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার হতে পরোক্ষে সাহায্য করেন। নবগঠিত হিতেশ্বর শইকিয়া মন্ত্রীমণ্ডলী ইন্দিরা কংগ্রেস দলভুক্ত বলে স্বজাতিদ্রোহী নন। সে অপবাদ সুরেন্দ্রনাথকেও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে অপবাদ মিথ্যা অপবাদ। বছরে চৌষট্টি হাজার টাকা বেতন পান বলে ব্যঙ্গচিত্র আঁকা হয়েছিল। যেন তিনি অর্থ-লোভে আত্মবিক্রয় করেছেন। কংগ্রেসীরাও পরে স্বরাজী সেজে নির্বাচনে নামেন ও আইনসভায় প্রবেশ করেন। মন্ত্রী হন না এই যা তফাৎ। এ পলিসি একদিন আসামের আন্দোলনকারীরাও অবলম্বন করতে পারেন।

আগে ভোটের তালিকা সংশোধন করতে হবে, তার পরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, এই জেদ বজায় থাকতে আবার নির্বাচন মানে তো আবার কুরুক্ষেত্র, আবার লঙ্কা-কাণ্ড। সে ঝুঁকি নেবে কে? জেদের সঙ্গে রয়েছে গায়ের জোর। গায়ের জোরে নির্বাচন বানচাল করব, গায়ের জোরে আবার নির্বাচন ঘটাব। ভোটার তালিকা সংশোধনও কি গায়ের জোরে হবে? আমরা যাদের নাম কাটতে বলব তাদের নাম কাটতেই হবে, না কাটলে মুণ্ডু কাটব, খেদিয়ে দেব। ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করব। ঘরবাড়ী জমি দোকান বাজেয়াপ্ত করব। এই যাদের চিন্তাধারা তারা গণতন্ত্র মানে না, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে না, জাতীয়তাবাদ যদি বা মানে সেটা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নয়, অসমীয়া জাতীয়তাবাদ। তার থেকে উপজাতীয়রা বাদ। আমি এর একটিমাত্র প্রতিকার জানি। আসাম থেকে তথাকথিত বিদেশী নাগরিকদের না সরিয়ে আসামকে আবার বিভক্ত করা ও যেসব জেলায় অসমীয়া প্রাধান্য সেসব জেলা আসামে রেখে আর সব জেলা আসাম থেকে কেটে নেওয়া। মুণ্ডু কাটার চেয়ে ল্যাজ কাটাই মন্দের ভালো। ল্যাজ দিয়ে আরেকটা রাজ্য হয়, আরেকটা ইউনিয়ন টেরিটরি হয়। তথাকথিত বিদেশী নাগরিকরা সেসব জায়গায় নিরাপদে বাস করবে। এমনিতেই অনেকে গোয়ালপাড়ায় ও কাছাড়ে অবস্থান করছে। উপজাতীয়দেরও আত্মরক্ষার জন্যে কয়েকটা এলাকা ছেড়ে দেওয়া উচিত।

এই পরিস্থিতি প্রধানমন্ত্রীর সৃষ্টি নয়। এর বীজ বোনা হয়েছে ব্রিটিশ আমলেই। চারা গজিয়েছে পার্টিশনের পরে। বাড়তে বাড়তে চারাগাছ হয়েছে বড়ো গাছ।

এখন সেটা বনস্পতি। অসমীয়াদের নিষ্কণ্টক না করলে তারা সন্তুষ্ট হবে না। এক-ভাষী রাজ্য তাদের চাইই চাই। আর সব রাজ্য একভাষী হয়েছে, আসামই বা হবে না কেন? রাজ্য পুনর্গঠন কমিটি ফতোয়া দিয়েছেন যে শতকরা সত্তরজন অধিবাসী অসমীয়া না হলে আসাম একভাষী হবে না। অসমীয়াদের সংখ্যা আপাতত শতকরা বাষট্টি। তারা আরো আটজনকে অসমীয়া বানাতে পারলেই একভাষী রাজ্য পাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে। যেসব বাঙালী মুসলমানকে তারা স্বাগত জানিয়েছিল তারা বেশ কিছুকাল নিজেদের ন'অসমীয়া বা নয়া অসমীয়া বলে পরিচয় দিয়ে অসমীয়াভাষীদের দল ভারী করেছিল। হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে। পূর্ব পাকিস্তান লড়াই করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ন'অসমীয়ারাও মাতৃভাষা সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে অসমীয়াভাষীদের সংখ্যানুপাত শতকরা বাষট্টি থেকে নেমে যায়। আসামের মাটিতে কখনোই যেটা ছিল না সেটাও ভূঁই ফুঁড়ে ওঠে। হিন্দু মুসলমানে ধর্মগত বিরোধ। আসামে ধর্ম নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা একবার ঘটেছিল ব্রিটিশ আমলের পূর্বে। সে বিরোধ হিন্দু মুসলমানের নয়, শাক্ত বৈষ্ণবের। বৈষ্ণব গিয়ে বার্মা থেকে বৌদ্ধকে ডেকে নিয়ে আসে। আসাম পরাধীন হয়। মগদের অত্যাচার দিন দিন বাড়ে। লোকে ত্রাহি ত্রাহি করে। তখন আসামের বন্ধু সেজে ইংরেজের আগমন। এক পরাধীনতার বদলে আরেক পরাধীনতা। তখন থেকে তারা ভাষা সম্বন্ধে স্পর্শকাতর। ধর্ম সম্বন্ধে নয়। শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্মও একান্ত উদার। শৈবরাও কম উদার নন। শিব মন্দিরে নহবৎ বাজায় মুসলিম বাদ্যকর। নইলে শিবের ঘুম ভাঙবে না। আসামের ঐতিহ্য এই প্রথমবার কলঙ্কিত হলো।

এমন যে হতে পারে এটা কিন্তু আমার মনে দশবছর আগে উদয় হয়েছিল। যেদিন কানে আসে একটি জঙ্গী হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন আসামে গিয়ে ডেরা বেঁধেছে সেইদিনই অনুভব করি যে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কে চিড় ধরবেই। এর পরে শুনি একটি জঙ্গী মুসলমান সাম্প্রদায়িক সংগঠনও আসামে গিয়ে বিপরীত দিক থেকে একই কাজ করছে। দুই বিষবৃক্ষের ফল একদিন ফলতই। এই উপলক্ষে না হোক অন্য কোনো উপলক্ষে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধতই।

কিন্তু এটাও গৌণ। মুখ্য যেটা সেটা হচ্ছে একভাষী রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইস্যুতে অসমীয়াদের সঙ্গে বাঙালীদের মন কষাকষি ও তার থেকে বল কষাকষি। দশ বছর আগে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন এক অসমীয়া হিন্দু অধ্যাপক। চমৎকার বাংলা বলেন। বলেন, "আপনারা পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা পেয়েছেন। এখন বাংলা-

দেশও পেলেন। তা হলে কেন আপনারা আসামকেও পেতে চান? ত্রিপুরায় গিয়ে আপনারা ত্রিপুরীদের তাদের নিজ বাসভূমে সংখ্যালঘুতে পরিণত করেছেন। আসামে গিয়ে অসমীয়াদের কি সংখ্যালঘুতে পরিণত করবেন? ভারত ও বাংলাদেশ মিলিয়ে বাঙালীদের সংখ্যা বারো কোটি। অপর পক্ষে, অসমীয়াদের সংখ্যা এক কোটিও নয়। হিন্দু শরণার্থী হিসাবেই হোক আর মুসলমান চাষী মজুর হিসাবেই হোক বাঙালীদের প্রবেশ যদি অব্যাহত থাকে তা হলে তো ওরাই একদিন হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। ওরাই রাজত্ব করবে, যেমন ত্রিপুরায়। হিন্দু শরণার্থীরা যেখানে খুশি যাক, কিন্তু আসামে আর নয়।"

অসমীয়ারা দ্বিভাষী রাজ্য চায় না, দ্বিভাষী স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় চায় না, এমন কী ইংরাজীতেও তাদের আপত্তি আছে, পাছে প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। বছর পনেরো আগে একজন মিজো ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন, "আমরা অসমীয়াদের ভালোবাসি। তাদের সঙ্গে একই রাজ্যে বাস করতে চাই। কিন্তু অসমীয়া হবে একমাত্র সরকারীভাষা এতে আমাদের আপত্তি আছে। ইংরেজীর সাহায্যে আমরা সরকারী চাকরি বাকরির প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে থাকি। ইংরেজী ছাড়তে আমরা নারাজ। কেরলের লোকের পর মিজোরাই সারা ভারতে সবচেয়ে বেশী লেখাপড়া জানে। আমাদের মেয়েরাও শিক্ষিত। আমরা কেন অসমীয়াদের কাছে ছোট হব?"

একই কথা বলেন শিলংএর এক খাসী ভদ্রলোক। "আমরা অসমীয়াদের ভালো-বাসি। একসঙ্গেই বাস করতে চাই। রাজ্যটা বড়ো হলে মনটাও বড়ো হয়। রাজ্যটা ছোট হলে মনটাও হয় ছোট। ছোট একটা রাজ্য নিয়ে আমরা বড়ো হব কী করে? কিন্তু ইংরেজী আমরা ছাড়ব না। হয় হবে রাজ্যভাগ।"

ওঁরা দু'জনেই খ্রীস্টান। দু'জনেই উচ্চশিক্ষিত। একটি খাসী ছাত্র ইংরেজীতে এমন চমৎকার ভাষণ দেয় যে আমি ভাবি এরা কিসে বাঙালীদের চেয়ে কম? সুযোগ পেলে এরাও তো ঘানা নাইজেরিয়া, তানজানিয়া চালাতে পারে। এরা যদি অসমীয়া হিন্দু আধিপত্য পছন্দ না করে তো কেন অসমীয়া হবে একমাত্র সরকারী ভাষা? বিমলাপ্রসাদ চলিহা ছিলেন তখন আসামের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি যেমন উদার তেমনি বিজ্ঞ। তাঁর মতে আসাম হচ্ছে দুই উপত্যকা আর এক গিরিমালার রাজ্য। অসমীয়া, বাঙালী, পাহাড়ী সবাই মিলে মিশে বাস করবে। সকলের জন্যেই আসাম। কেবল অসমীয়াদের জন্যেই নয়। তিনি রাজ্য ভাগাভাগির বিপক্ষে। কিন্তু ঘটনার স্রোত

তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। তিনি ব্যর্থ হন। কিছুদিন পরে পরলোকে যান। মেঘালয় হয় পৃথক রাজ্য। মিজোরাম হয় ইউনিয়ন টেরিটরি। অবশিষ্ট আসামের সরকারী ভাষা হয় রাজ্যস্তরে অসমীয়া, জেলাস্তরে বাংলা ইত্যাদি। এতে কোনো পক্ষই সন্তুষ্ট নয়। বাঙালীরা চায় রাজ্যস্তরে উঠতে। অসমীয়ারা চায় নিম্নস্তরেও নামতে।

দশ বছর আগে বঙ্গাতঙ্কই ছিল একমাত্র আতঙ্ক। ইতিমধ্যে আরেকটি আতঙ্ক তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সেটি ইসলামাতঙ্ক। কে জানে বাংলাদেশের মনে কী আছে? সে কি আসামকে গ্রাস করবে? বিহারী মুসলমানরাও নাকি বাংলাদেশ থেকে তাড়া খেয়ে আসামে অনুপ্রবেশ করছে। সব দরজা জানালা বন্ধ করা চাই। নইলে আসামের কপালে লেখা আছে মুসলিম রাজ। সব রকম মুসলমানই একজোট হবে, কী বাঙালী, কী অসমীয়া, কী বিহারী। অসমীয়া হিন্দুরা এখন এককাট্টা। আন্দোলনকারীদের নির্দেশ মান্য করছেন সরকারী বেসরকারী কর্মচারীরাও, মায় পুলিশ। কতকটা ভয় থেকে, কতকটা সহানুভূতি থেকে। মহিলারাও আন্দোলনকারীদের পক্ষে।

আমরা যারা অসমীয়াদের ভালোবাসি তারা কি তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ কামনা করতে পারি? আমার তো ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু আমি নিজের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন। আমি মানুষকে ভালোবাসি, পাপকে ভালোবাসিনে। যেসব কাণ্ড কারখানা ঘটছে সেসব কোনো মতেই সমর্থন করা যায় না। যদি কেউ সমর্থন করেন তো বুঝতে হবে তিনি পাপপুণ্যের প্রভেদ ভুলে গেছেন। অহিংসার সঙ্গে হিংসা মিশিয়ে দিলে সেটা আর অহিংসা থাকে না। অহিংসার তেমন কোনো ব্যাখ্যা যদি কেউ করেন তবে তিনি গান্ধীজীর কাছ থেকে অনেক দূর সরে এসেছেন। সব কিছুতেই তিনি ইন্দিরা গান্ধীর কারসাজি দেখছেন। ইন্দিরা গান্ধী না থাকলেও একই ব্যাপার ঘটত। সাধারণ নির্বাচন চিরকাল ঠেকিয়ে রাখতে পারা যেত না। রাষ্ট্রপতি শাসন চিরকাল প্রলম্বিত করা যেত না। সংবিধান সংশোধন এক তরফা হতো না। ভোটার তালিকা সংশোধন নির্বিবাদে হতো না। বিবাদ গড়াত সুপ্রীম কোর্ট অবধি। একবার তাঁরা ভারতরাষ্ট্রের দায়িত্ব নিয়ে দেখুন না, কেমন করে দশলক্ষ নরনারী ও শিশুকে নিগ্রো ক্রীতদাসের মতো রেল ওয়াগনে ভর্তি করে রাজ্যে রাজ্যে চালান দেওয়া যায় ও যত্র তত্র কয়লার মতো উজাড় করে দেওয়া যায়। ইন্দিরাজী ১৯৭১ সালের থেকে অপসারণের দায় মাথায় নিচ্ছেন। এই

নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ঠোকাঠুকি বেধে না যায়। বাংলাদেশ বিমুখ হলে বিতাড়িত মুসলমানদের আসামের বাইরে আর কোন্ রাজ্য ঠাঁই দেবে? বিতাড়িত হিন্দুদেরও কি বিহারী বা ওড়িয়ারা ঘরে ঢুকতে দেবে? কোথাও ধর্মভেদের জন্যে মুসলমানরা অবাঞ্ছিত। কোথাও ভাষাভেদেদের জন্যে হিন্দুরা অবাঞ্ছিত। এই বেচারিদের ভিয়েট-নামের বা কাম্পুচিয়ার বোট পীপলের মতো জলে ভাসিয়ে দেওয়া হবে কি? অনেকেই ডুবেছে। যারা ডাঙায় উঠতে পেরেছে তাদের আবার ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আসামের এই ট্র্যাজেডি আমাকে অভিভূত করেছে। কিন্তু আমি জানি যে বাইবেল যা বলেছে সেটাই সত্য। বীজ বুনলে গাছ গজায়। বাতাস বুনলে ঝড় গর্জায়। মন্ত্রীদের হটাও, আবার নির্বাচন করো, বিরোধী পক্ষকে জিতিয়ে দিয়ে গদীতে বসাও, কিন্তু হিন্দু শরণার্থী আর মুসলিম উপনিবিষ্টদের শিকড়সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে আর কোথাও রুইতে যেয়ো না। ওদের সম্পত্তিতে হাত দিয়ো না। ওরাও মরণ কামড় দিতে জানে। পরিস্থিতি যত খারাপ তার চেয়েও খারাপ হতে পারে। ইন্দিরা গান্ধী ব্যতীত আর কে সামাল দিতে পারবেন? আগে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসুক। তার পরে আসাম সম্বন্ধে একটা সর্বসম্মত সমাধান খুঁজে বার করতে হবে।

এ সমস্যা পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় অনাবাদী জমি আবাদ করে চিনি উৎপাদন করার জন্যে ব্রিটিশ শাসিত ভারত থেকে মজুর আমদানী করতে হয়েছিল। কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী। তাদের বলা হলো, দেশে ফিরে যাও। তারা ফিরে এলে থাকবে কোথায়, খাবে কী? দেশে যা কিছু ছিল সব বেদখল হয়ে গেছে। কালাপানী পার হওয়ায় জাতও গেছে। তারা কোনো রকমে দিন গুজরান করে দক্ষিণ আফ্রিকায় থেকে গেল। তখন একটা মোক্ষম চাল চালা হলো। যাদের নাম উঠেছিল ভোটার তালিকায় তাদের নাম কেটে দেওয়া হলো। যাদের নাম ওঠেনি তাদের নাম উঠলই না। বড়ো বড়ো শহর থেকে তাদের সরিয়ে নিয়ে বিশ ত্রিশ মাইল দূরে থাকবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। পাশ না নিয়ে তারা শহরে ঢুকতে পারে না। শহরের সম্পত্তি নামমাত্র দামে কিনে নেওয়া হয়েছে। আইন অনুসারে তারা সাউথ আফ্রিকান ন্যাশনাল। কিন্তু তাদের গায়ের রং শাদা নয়। তাদের 'রেস' আলাদা। খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষা নিয়েও নিস্তার নেই। আসাম কি সেই পথে চলতে চায়? তা যদি হয় তবে সর্বসম্মত সমাধান হবার নয়, হবেও না। সেই গানের কথা একটু বদলে দিয়ে আমরা গাইব, "কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে, তাই ঝড়ের কুসুম করিনু চয়ন হতাশে।"

বর্ণবিদ্বেষ

আশ্চর্যের কথা, বর্ণবিদ্বেষ আমেরিকায় কমছে, ব্রিটেনে বাড়ছে। এই সম্প্রতি ব্রিটেনে যা ঘটে গেল তা কারো পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়। দুই পক্ষই মারমুখী হয়ে দুই পক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ঘরবাড়ীতে আগুন ধরিয়েছে। লুটপাট করেছে। কিন্তু শুক্লপক্ষের সবাই ইংরেজ বা স্কটস (স্কচ কথাটা ওঁরা পছন্দ করেন না) হলেও কৃষ্ণপক্ষের সবাই ভারতীয় বা পাকিস্তানী বা বাংলাদেশী নয়, বেশির ভাগই জ্যামেকা প্রভৃতি দ্বীপের লোক, যাদের দেশের নাম এককথায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। এসব দ্বীপের অবস্থান ভারতের বিপরীত দিকে, এসব দ্বীপের আদি বাসিন্দারা কোনো অর্থেই ভারতীয় বা ইণ্ডিয়ান নয়, অথচ কলম্বসের ভুলের খেসারৎ দিতে হচ্ছে আসল ইণ্ডিয়ানদেরও। ওরাও ইণ্ডিয়ান আমরাও ইণ্ডিয়ান, অতএব উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে। ওদের বেয়াদবির জন্যে আমরাও অপ্রিয়। আর আমাদের অপ্রিয়তার জন্যে ওরাও।

তা ছাড়া পাকিস্তানীকেও অনেক সময় ভারতীয় বলে ভুল করা হয়। তেমনি ভারতীয়কেও পাকিস্তানী বলে। চব্বিশ বছর ধরে বাংলাদেশের লোকও ভারতীয় বলে পরিচিত হয়েছিল, তার জের এখনো মেটেনি। যে মারটা পাকিস্তানীদের পাওনা সেটা বাংলাদেশের লোকের পিঠেও পড়ে। একই রকম দেখতে বলে ভারতীয়দের পিঠেও। একে বলা হয় "পাকি ব্যাশিং।" পাকি ঠ্যাঙানো। আমার পুত্রের বন্ধু ও আমার পুত্রপ্রতিম নিমাই চট্টোপাধ্যায় বিনা অপরাধে তিন তিনবার এর ভুক্তভোগী। নিমাই আমাদের চোখে বেশ ফরসা, কিন্তু ওদের চোখে বেশ কালো। ওরা বর্ণান্ধ। বলা বাহুল্য সবাই নয়। তাই যদি হতো তবে নিমাই ওদেশে চাকরি পেতো কী করে? এক শতাব্দীর এক চতুর্থ ভাগ ওদেশে বাস করতো কী করে? সুধী মহলেও জনপ্রিয়। তাঁদের সঙ্গে সমানে মেলামেশা।

বাহান্ন তিপান্ন বছর আগে বিলেতে যখন ছিলুম তখন সেখানে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল লাখ দেড়েক। ইংরেজরা বলত সেই যথেষ্ট। তার বেশী ওরা আসিমিলেট করতে অপারগ। ইহুদীরাও গজগজ করত। কেন ওদের আরো বেশী সংখ্যায় আসতে

দেওয়া হচ্ছে না ? কেন ওদের সঙ্গে অমন ব্যবহার করা হচ্ছে ? তখনো হিটলারের অভ্যুদয় হয়নি। তখনি ইহুদিদের নিয়ে এই সমস্যা। পরে এটা আরো উৎকট হয়। এখন তো ইহুদীবিদ্বেষ নতুন করে মাথা চাড়া দিচ্ছে। সেটা বর্ণবিদ্বেষ নয়, জাতি-বিদ্বেষ। ইহুদীরা হাজার চেষ্টা করলেও ইংরেজদের সঙ্গে মিশে যেতে পারে না, তাদের ইহুদীত্ব বজায় রাখতে চায়। কেউ কেউ সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়, সদর্পে জাহির করে। ওদের মধ্যে যারা বড়লোক তারা খুবই বড়লোক। এতে সাধারণ ইংরেজের চোখ টাটায়। হিটলারী অত্যাচারের ফলে ইহুদীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। সেটাও একটা কারণ। একদিন যারা দেড় লক্ষ ইহুদীকে অ্যাসিমিলেট করতে রাজী ছিল, তার বেশী নয়, তারা এখন ভিতরে ভিতরে নারাজ। কিন্তু ধনী মানী গুণী জ্ঞানী ইহুদীদের এত বেশী প্রভাব যে তাদের মেরে তাড়িয়ে দেবার কথা চিন্তা করা যায় না, তবু কয়েক হাজার যুবক নয়া নাৎসী হয়েছে। জনমত তাদের বিরোধী।

ভারতীয়দের সংখ্যা আমার অবস্থানকালে বোধহয় এক লাখেরও কম ছিল। এখন দশ লাখেরও বেশী। পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী সমেত। আর ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানের সংখ্যা বোধহয় আরো কয়েক লাখ বেশী। কালো ও বাদামী রঙের মানুষ মিলে মোট সংখ্যা শুনেছি পঁচিশ লাখের মতো। এদের অ্যাসিমিলেট করতে ইংরেজরা অক্ষম। তাদের ঐতিহ্য হলো দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করা। বিদেশ থেকে অন্যেরা এসে ওদের দেশেই উপনিবেশ স্থাপন করবে এটা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ওরা সাময়িকভাবে এক আধ লক্ষকে আশ্রয় দিতে পারে, কিন্তু স্থায়ীভাবে পঁচিশ লক্ষকে স্থান দিতে অনিচ্ছুক। ওদের বক্তব্য হলো, আমাদের দ্বীপটি ছোট, নিজেদেরই জন-সংখ্যা অত্যধিক, আমরা তেমন সম্পদশালীও নই, নিজেদেরই কত অভাব। ঠাঁই নাই ঠাঁই ছোট এ তরী, ভরাডুবি হবে যদি বোঝাই করি। তোমাদেরও দরকার ছিল, আমাদেরও দরকার ছিল, তা বলে চিরকাল তোমরা এদেশে থাকবে, এত বেশী সংখ্যায় থাকবে, এটার জন্যে আমরা প্রস্তুত নই।

ন্যাশনালিটি আইন রক্ষণশীলদের আমলে আরো কড়া হয়েছে। ব্রিটিশ প্রজা হলেও ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি এখন আর সহজলভ্য নয়। প্রতিবাদ আমাদের মুখে সাজে না, কারণ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিটিও সহজলভ্য নয়। আমাদের তুলনায় ইংরেজরা আরো উদার। ইংরেজ পুরুষ যদি ভারতীয় নারীকে বিবাহ করে স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর ন্যাশনালিটি পায়। কিন্তু ভারতীয় পুরুষ যদি ইংরেজ নারীকে বিবাহ করে স্ত্রীকে বহু-

কাল অপেক্ষা করতে হয়। আমি যতদূর জানি পাঁচবছর। দশ লক্ষ ইংরেজ এদেশে কোনদিন ছিল না, সওয়া লক্ষের মতো ছিল, বেশীর ভাগই সৈনিক। স্থায়ীভাবে বসবাস কেউ করত না, ভারতীয় ন্যাশনালিটি বলে স্বাধীনতার আগে কিছু ছিলও না। পরে জনাকয়েক ইংরেজ স্বেচ্ছায় ভারতীয় ন্যাশনালিটি চান ও পান। যেমন হলডেন, যেমন এলউইন। সে সকল প্রার্থীর সংখ্যা লক্ষ লক্ষ হলে আমরা ভারতের দরজা বন্ধ করে দেব। যদিও ইংলণ্ডের তুলনায় বড়ো এ তরী।

ইংরেজদের একটা প্রবাদ, রোমে গেলে রোমানদের মত আচরণ করতে হয়। কিন্তু ভারতীয়রা যখন ইংলণ্ডে যায় তখন ইংরেজদের মতো আচরণ করে না। ঢেঁকী স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। দীর্ঘকাল বাস করেও ইংরেজী বলতে পারে না, গণ্ডীর বাইরে যায় না, 'পাবে' গিয়ে বীয়ার খায় না ও খাওয়ায় না, হিন্দুরা বীফ খায় না, মুসলমানরা বেকন খায় না। মেলামেশা কেবলমাত্র আপিসে বা কারখানায় বা দোকানে। নাচতে গেলে মেয়েদের নিয়ে যাবে না, অথচ নাচের শখটি আছে। সাঁতার কাটতে গেলে মেয়েদের নিয়ে যাবে না, যদিও মিশ্র সন্তরণেরও সাধ। হিন্দু মুসলমান শিখ কেউ গীর্জায় যেতে চায় না। শিখেরা তাদের পাগড়ি কিছুতেই খুলবে না, যেখানে মাথা খোলা রাখাই নিয়ম সেখানেও না, যেখানে মাথায় হেলমেট পরাই নিয়ম সেখানেও না। গুজরাটী দোকানদাররা ইংরেজ খদ্দেরদের যত সস্তায় যত রকম মাল জোগায় আসল ইংরেজরা তত সস্তায় তত রকম নয়। তাদের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে আফ্রিকা থেকে তাড়া খেয়ে। প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের নেটিভরা হেরে যাচ্ছে। এটাও একটা কণ্টক। তাই নিষ্কণ্টক হতে চায়। পাকিস্তানীদের ব্যবহার অত ভদ্র নয়। তাই তাদের উপর বিরাগ আরো বেশী। আর বাংলাদেশীরা এক একটা বাসায় এত বেশী সংখ্যায় থাকে যে তাদের জীবনযাত্রা পাড়ার ইংরেজদের চোখে অশ্রদ্ধেয়। অথচ ওদের দর্জিরা যত সস্তায় স্যুট বানাতে পারে আর কেউ তত সস্তায় নয়। আর ওদের রেস্টোরাণ্টগুলো যত সস্তায় খাওয়াতে পারে আর কেউ তত সস্তায় নয়। সেই রেস্টোরাণ্টের সংখ্যাও শত শত। চীনাদের পরেই বাঙালীরা। খাবারটা কিন্তু বাঙালীর খাবার নয়। লস্কর হিসাবেও বাংলাদেশীরা অত্যাবশ্যক।

এবারকার সংঘর্ষের প্রথম ধাক্কায় অনেকেই চেয়েছিল দেশে ফিরে আসতে। পরে আবার তারাই বলতে আরম্ভ করেছে, "আমরাও দেখে নেব ওরা কী করতে পারে। আমাদেরও গায়ে জোর আছে।" সম্পত্তির মায়া কাটিয়ে ওঠাও শক্ত। খেলাটা জমবে ভালো।

ইংরেজরা সাম্রাজ্য ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু বাণিজ্য ছেড়ে দেয়নি। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে তাদের প্রয়োজন ও লাভ। আবার যদি যুদ্ধ বাধে ভারতীয় সৈন্যও তাদের আবশ্যক। ব্রিটেনে বসবাসকারী শিখরাই তাদের ভরসা। তারাও রাজভক্ত। ইংরেজী বইয়ের চাহিদা স্বাধীন ভারতে কমেনি, বরং বেড়েছে। ইংরেজী বইয়ের এত বড়ো একটা বিদেশী বাজার আর কোন্‌খানে? সব দিক বিবেচনা করলে ভারতের সঙ্গে বন্ধুতাই ইংলণ্ডের কাম্য। একই কমনওয়েলথে উভয়ের অধিষ্ঠান। ইংলণ্ডের রানীই কমনওয়েলথের শিরোমণি। ইংরেজরা তাদের উগ্রপন্থীদের সংযত রাখবে বলেই মনে হয়। তারাও বেকার বলেই অতটা উগ্র। হাতে কাজকর্ম থাকলে ওরা এর জন্যে সময় পেতো না বোধহয়।

এই পর্যন্ত লিখে কাল শুতে যাই। আজ সকালে উঠে দিল্লী থেকে প্রকাশিত "হিন্দুস্থান টাইমস্" পড়ছি আর লক্ষ করছি একটি পনেরো বছর বয়সের মেয়ের লেখা চিঠি। মেয়েটি বাপমার মনে কষ্ট হবে বলে নাম ছাপতে দেয়নি। তার বেদনা দেশের কালো মেয়েদের সকলের বেদনা। চিঠির কতক অংশ উদ্ধৃত হলো—

"Though there is no discrimination of colour in the eyes of law (information collected from my civics book), I do feel that there is discrimination of colour in our society. Haven't you heard people saying, "She is sooo....fair!" If she is fair, it is taken for granted that she is beautiful. This is not so of a dark girl with sharp elegant features. The people say, 'She is dark'. Ugh! 'Dark' word is something which always makes a person sound unattractive. Why has society developed such a feeling that only the fair are beautiful and not the dark?"

তারপর লিখেছে ওর নিজের রং কালো, ওর বাপের রং কালো, ওর মায়ের রং ফরসা, ওর কাজিনদের রং ফরসা। এ নিয়ে পরিবারের ভিতরেই বর্ণ বৈষম্য। গায়ের রং নিয়ে বাছ বিচার। ওর কাজিনরা ওর সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যেন ও একটি 'কালো ভেড়া।' ওর মা ওর জন্যে মনে মনে লজ্জিত। অর্থাৎ ওর গায়ের রং-এর জন্যে। লোকে যখন ওর মায়ের সঙ্গে ওর গায়ের রং-এর তুলনা করে তখন ও প্রায়ই চোখের জল ফেলে।. ওর ধারণা ওর রং যদি কালো না হতো ওকে সবাই সুন্দর

বলত। কালো পোশাক পরলে নাকি ওকে ফরসা দেখায়, কিন্তু ওর মা ওকে কালো পোশাক পরতে দেবেন না।

আমার ধারণা ছিল এটা শুধু বাঙালী সমাজের দুর্বলতা। তা নয়। চিঠি থেকে মনে হচ্ছে এ মেয়েটি দক্ষিণী। এটা আমাদের গোটা ভারতীয় সমাজেরই দুর্বলতা। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা এদেশে দেবতার সম্মান পেয়ে রাজত্ব করে গেছে। ওরা যদি গোরা না হয়ে কালা হতো ওদের রাজত্ব অতদিন টিকত না। বর্ণ-বিদ্বেষ আমাদের সমাজে বোধহয় সেই আর্য অনার্য বর্ণ বৈষম্যের যুগ থেকেই গভীর-ভাবে নিহিত। বর্ণাশ্রমের মধ্যেও সেই বর্ণ বৈষম্য প্রকারান্তরে স্বীকৃত। ব্রাহ্মণরা গৌরবর্ণ, ক্ষত্রিয়রা পীতবর্ণ, বৈশ্যরা রক্তবর্ণ, শূদ্ররা কৃষ্ণবর্ণ। এর তাৎপর্য কি আর্য, মঙ্গোলীয়, দ্রাবিড, অস্ট্রিক? নৃতত্ত্ববিদ্‌রা এ ব্যাখ্যা দিতে পারেন। আমার যতদূর মনে হয় আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই এই বর্ণঘটির সংস্কার উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছি। তাই ইংরেজদের দোষ দেবার আগে আত্মসমালোচনা করা উচিত। কালো মেয়ের দুঃখ দূর হলে কালা আদমীরও দুঃখ দূর হবে। সে জাতিহিসাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান পাবে।

উচ্চবর্ণের বর্ণান্ধতা আমরা কে না লক্ষ করেছি? আমার বন্ধুর মাকে যখন পা ছুঁয়ে প্রণাম করি তিনি আমাকে আশীর্বাদ না করে তিরস্কার করেন। "ছি ছি! আমি এইমাত্র স্নান করে উঠেছি। শূদ্দুরটা আমাকে ছুঁয়ে দিল।" আমার নিজের মাও ছিলেন তেমনি শুচিবাতিকগ্রস্ত। বলেছিলেন, "বদ্দির মেয়েকে আমি আমার হেঁসেলে ঢুকতে দেব না।" তাঁর বোধহয় ধারণা কায়স্থরা বৈদ্যদের চেয়ে উঁচু জাত! কিন্তু বৈদ্যরা সেটা মানবেন কেন? চট্টগ্রামে আমার সাহিত্যিক বন্ধু ছিলেন আশুতোষ চৌধুরী। তিনি কায়স্থ, তাঁর স্ত্রী বৈদ্য। চট্টগ্রামে এটা নতুন কিছু নয়, পুরাতন প্রথা। আশুবাবু একদিন আক্ষেপ করে বলেন, "শ্বশুরবাড়ী গেলে আজকাল আমাকে আলাদা খেতে দেয়। আমার শ্যালকরা আমার সঙ্গে খাবে না। কারণ আমরা কায়স্থ, ওরা বৈদ্য। কিন্তু শাশুড়ী আমাকে আগের মতো যত্ন করে খাওয়ান।" এটা হলো দেশভাগের প্রায় দশবছর আগের ঘটনা। আর আমার মায়ের ব্যবহারটা তার প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বের। আর আমার বন্ধুর মায়ের ব্যবহার স্বাধীনতার পাঁচবছর পরের। বলতে ভুলে গেছি যে আমার বন্ধু ব্রাহ্মণ। নিজে একান্ত উদার।

বিলেতে থাকতে রবীন্দ্রনাথের একটি ভাষণের রিপোর্ট লণ্ডনের 'টাইমস' বা ম্যাঞ্চেস্টারের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকায় পড়েছিলুম। কবি দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে

হিন্দুসমাজের এক জাতের লোক আরেক জাতের লোকের প্রতি কায়িকভাবে জুগুপ্সা বোধ করে। যতদূর মনে পড়ে, শব্দটা ছিল রিভালসন। কবি আর যা বলেছিলেন তা আমার মনে নেই। দেশ তখন মিস্ মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া' পড়ে ক্ষিপ্ত। কবির উক্তি নজরে পড়লে তাঁর উপরেও খাপ্পা হতো। আমাদের স্বাধীনতার দাবীটা দুর্বল হবে বলে আমরা আমাদের সমাজের সনাতন ব্যাধিগুলো গোপন করে ধর্মের ভেকটাকেই জগতের সামনে তুলে ধরতুম। স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু ব্যাধি-মুক্তি এখনো বহুদূর। হরিজনদের উপর বিভিন্ন প্রান্তে যে অত্যাচারটা চলেছে সেটা আর্য আধিপত্যের যুগ থেকেই অব্যাহত। শম্বুকের মুণ্ডচ্ছেদ, একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছেদ রামায়ণ মহাভারতে কীর্তিত হয়েছে। সেকালেও এদেশে দক্ষিণ আফ্রিকার মতো একপ্রকার আপার্টহাইড ছিল। শহরের বা গ্রামের এক এক এলাকায় এক এক জাতের বাসস্থান। যে যত নিচে সে তত দূরে। অস্পৃশ্যরা তো একদম বাইরে। এ ব্যবস্থা কি এখনো সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে?

স্বাধীনতার কিছুদিন আগে একবার এক ক্লাবে উচ্চপদস্থ বাঙালী অফিসাররা ইংরেজ রাজত্বের নিন্দাবাদ করছিলেন। চুপ করে শুনছিলেন বাঙালী সাবজজ মশায়। ব্রাহ্মণ কালেকটর সাহেব তাঁর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "কী, মশায়, আপনি চুপ করে আছেন যে!" সাবজজ মুখ তুলে বলেন, "আমি জাতে রজক। আমলটা ইংরেজ আমল বলেই আমি সাবজজ হতে পেরেছি, আপনাদের সামনে চেয়ার পেতে বসতে পারছি। আপনাদের আমলে কি এটা সম্ভব ছিল? কেন তবে ইংরেজ রাজত্বের নিন্দাবাদ করব?" এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ইংরেজরা এসে কতকগুলি জাতকে হিন্দুশাসনের অত্যাচার থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে। তার জন্যে তাদের ধর্মান্তরিত করেনি। পরাধীনতাও কারো কারো পক্ষে উন্নতির সোপান হতে পারে। যেমন আদিবাসী ও হরিজনদের পক্ষে। ব্রাহ্মণ কালেকটর রজক সাবজজের কথা শুনে নিজেই চুপ করে থাকেন। রামায়ণের যুগ হলে তাঁর মুণ্ডু কাটতেন, মহাভারতের যুগ হলে বুড়ো আঙুল কাটতেন।

এই দেশটিও একদা এক দক্ষিণ আফ্রিকা ছিল। দক্ষিণ ভারত এখনো সেই ঐতিহ্যের জের টেনে চলেছে। স্বাধীনতা অব্রাহ্মণদের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছে, কিন্তু অব্রাহ্মণদের মধ্যে যারা অস্পৃশ্য তাদের শাপমোচন এখনো ঘটেনি। তাই তারা এবার বুদ্ধের শরণ নয়, মহম্মদের শরণ নিচ্ছে।

ধর্ম ও রাজনীতি

বছর কয়েক আগে আন্তর্জাতিক পি. ই. এন কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয় সুইডেনের রাজধানী স্টকহোল্‌ম নগরে। সেই সূত্রে আমার কাছে একখানি চিঠি আসে। তার সঙ্গে একটি প্রস্তাবের খসড়া। খসড়াটি সেই অধিবেশনে উত্থাপন করতে চান আমেরিকার নিউইয়র্ক পি. ই. এন কেন্দ্রের একজন সদস্য। জানতে চান ভারতীয় পি. ই. এন কেন্দ্রের সমর্থন আছে কি না। প্রস্তাবের মর্ম ইরান সরকার যেসব বুদ্ধিজীবীকে দীর্ঘকাল বিনা বিচারে বন্দী করে রেখেছেন তাঁদের মুক্তি দিতে এই লেখক সম্মেলন অনুরোধ জানাচ্ছে। বন্দীদের একটা তালিকাও ছিল খসড়ার সঙ্গে জোড়া। সেটাতে চোখ বুলিয়ে দেখি পঁচিশ ত্রিশজনের নাম। কিন্তু এ কী! সাত আটজনের নাম কেন আয়াতোল্লা? ওটা কি নাম না পদবী না উপাধি? মানে কী ওর? আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় যে এঁরা বোধহয় ধর্মগুরু। আমাদের মতো বুদ্ধিজীবী নন। এঁদের জন্যে দরবার করা পি. ই. এন সম্মেলনের সাজে না। তা হলে বেছে বেছে সুপারিশ করতে হয়। বাছাই করা আমার সাধ্য নয়। আমি উত্তর দিই যে ভালো করে খোঁজ খবর না নিয়ে ঢালা সুপারিশ করা যায় না। আর খোঁজ খবর নেওয়া আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। তখন মনে হয়নি, পরে মনে হয়েছে যে মুক্তির আবেদন না করে বিচারের আবেদন করাই ছিল সঙ্গত। স্টক-হোল্‌মে কী হলো তার বিবরণ প্রকাশিত হতে দেখিনি।

এর কিছুকাল পরে ইরানের শাহ্‌ আন্দোলনের চাপে দেশত্যাগ করেন ও সে আন্দোলন পর্যবসিত হয় ইসলামী বিপ্লবে। তার পুরোধা আয়াতোল্লা খোমেইনী। তখনি বোঝা গেল আয়াতোল্লা একটা নামও নয়, পদবীও নয়, উপাধিও নয়, শিয়া সম্প্রদায়ের জনা ত্রিশেক ধর্মগুরুর পদ। এঁদের মধ্যে প্রবীণতম যিনি তাঁর নাম রুহোল্লা ও পদবী খোমেইনী। ইনি বছর পনেরো আগে দেশত্যাগ করে প্রথমে ইরাকে ও পরে ফ্রান্সে আশ্রয় নেন। বিদেশ থেকেই আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। সুতরাং উপরোক্ত তালিকায় এঁর নাম থাকার কথা নয়। অন্তত আমার তো স্মরণ

নেই। তবে আর যেসব আয়াতোল্লার নাম বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত ও বিশ্বময় প্রচারিত তাঁদের অনেকের নাম বোধ হয় পি. ই. এন সম্মেলনে উঠেছিল। অন্তত বিবেচনাধীন ছিল। আহা, তখন যদি জানতুম যে এঁরাই হবেন একদিন ইরানের হর্তা কর্তা বিধাতা তা হলে এঁদের মুক্তির জন্যে আবেদন করে আমিও একজন ইসলামভক্ত ও বিপ্লবদরদী বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতুম। কিন্তু বিপ্লবী জমানায় যেসব বুদ্ধিজীবীকে বিনা বিচারে বন্দী করা হয়েছে বা নামমাত্র বিচারে বধ করা হয়েছে বা দেশ থেকে পালিয়ে বাঁচতে হয়েছে তাদের কথা চিন্তা করলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা মনুষ্যত্ব নয়। আর বাহাই সম্প্রদায়ের উপরে শুধুমাত্র বাহাই হওয়ার অপরাধে যে উৎপীড়ন চলেছে সে অন্যায়ের দায় আমার উপরেও অর্শাত।

বাহাইরা নানাদেশে বাস করেন, কোথাও রাজনীতিতে অংশ নেন না। কিন্তু বাহাই ধর্মের প্রবর্তক আবদুল বাহা স্বদেশ থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসিত হয়ে প্যালেস্টাইনে শেষ জীবন যাপন করেন। সেখানেই স্থাপন করেন বাহাই ধর্মের আন্তর্জাতিক সদর। তখনো ইসরায়েলের উদ্ভব হয়নি। প্যালেস্টাইন ছিল তুরস্কের অধিকারে। অবস্থান পরিবর্তিত না হওয়ায় সদর এখন ইসরায়েলের অধিকারে। ইসরায়ল যেহেতু আরবদের শত্রু আর আরবদের বেশীর ভাগ ইসলামের অনুগামী সেহেতু ইরানেরও শত্রু। সুতরাং বাহাইরাও শত্রু। বিশেষ করে ইসলামী বিপ্লবের পর। সে বিপ্লব রাজনীতিকে ধর্মের সঙ্গে আর ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে একাকার করে আদি ইসলামী আদর্শ অনুসরণ করতে চায়। সে আদর্শ থেকে রাজা-রাজরারা দূরে সরে এসেছিলেন। মোল্লারাও রাজা-রাজরাদের উপর হুকুম জারি করেননি। তবে এটাও সত্য যে ইরানের বিংশ শতকের প্রথম গণতান্ত্রিক সংবিধানে মজলিস কর্তৃক আইন প্রণয়ণের পরে মোল্লাদের অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল, শুধু রাজার সম্মতিই যথেষ্ট নয়। সেই বাধ্যবাধকতা ক্রমে তামাদি হয়ে যায়। পরে তো গণতন্ত্রও তামাদি হয়। সেটা রাজাদের মর্জিতে। বিপ্লবের হেতু ছিল বইকি। তা বলে ইসলামী বিপ্লবের? হ্যাঁ, এরও হেতু ছিল। যেখানে কমিউনিস্টরা সক্রিয় সেখানে রাজার পতন হলে তারাই হতো রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা। তখন তাদের বিপক্ষে দাঁড়ায় কার সাধ্য! সেইজন্যে আগে থাকতে ক্ষমতা দখলের দরকার ছিল আর সেটা শস্ত্রের জোরে নয়, শাস্ত্রের জোরে। আয়াতোল্লারা হলেন শাস্ত্রবিশারদ। আয়াতোল্লা খোমেইনীর পরিচালনায় ধর্মোন্মাদ জনতা সশস্ত্র সৈনিকদের সম্মুখীন হয়। ওরাও স্বধর্মীদের ঘাতক হতে ভয় পেয়ে ভঙ্গ দেয়। ইরানের বিপ্লব বিপ্লবের ইতিহাসে অভূতপূর্ব।

পরবর্তী ঘটনাগুলো কিন্তু নজীরবিহীন নয়। শাহী জমানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আবাল-বৃদ্ধবনিতাকে একধার থেকে কোতল। হাতে পেলে সপরিবারে রাজারও শিরচ্ছেদ হতো। তাঁকে চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে ভর্তি হতে দেওয়ার প্রতিশোধে আমেরিকান সরকারের দূতদের বিনা বিচারে বন্দী করা হয়। এক বছরের উপর তারা বন্দী থাকে। এটা রাজনীতিসম্মত হতে পারে, ধর্মসম্মত নিশ্চয়ই নয়। ইরানের নিষ্ঠুরতায় হতভম্ব হয়ে আমার এক উচ্চপদারূঢ় মুসলিম বন্ধু বলেন, "এতে ইসলামেরই বদনাম হচ্ছে। লোকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করবে।" কিন্তু ইসরায়েলবিদ্বেষ মুসলিম সাধারণের বিবেককে ঘুম পাড়ায়। মার্কিনরা যে ইসরায়েলের মিতা। শাহ্ও ছিলেন মিতার মিতা। মরুন না চিকিৎসার অভাবে। একমাত্র মিশরই তাঁকে আশ্রয় দেয়। তার জন্যে প্রেসিডেন্ট সাদাতেরও তো প্রাণ গেল। শাহ্ বা সাদাত কারো জন্যে শোকের লহর বয়ে গেল না ইসলামী দুনিয়ায়।

যীশু খ্রীস্ট বলেছিলেন, "সীজারকে দাও যা সীজারের, ঈশ্বরকে দাও যা ঈশ্বরের।" তার মর্ম রাজনীতি ও ধর্ম অভিন্ন নয়, ভিন্ন। এই ভিন্নতাবোধ কিন্তু পরবর্তীকালের খ্রীস্টীয় সাধুরা পরিত্যাগ করেন। তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এমন প্রভাব অর্জন করেন যে সঙ্ঘই রাষ্ট্রের উপর ক্ষমতা বিস্তার করে। সঙ্ঘের সর্বাধিনায়ক সম্রাটের উপর কর্তৃত্ব করেন। প্রয়োজনও ছিল স্বৈরাচারীর উপর নিয়ন্ত্রণের। নিরঙ্কুশের উপর অঙ্কুশের। চার্চের সঙ্গে পরে একদিন স্টেটের সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষ থেকে ঘটে বিচ্ছেদ। অবশেষে এক অনুগত পাদ্রীই পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষক হন সম্রাটের অনুগত রাজন্যদের অনেকে। চার্চ দু'ভাগ হয়ে যায়। একভাগ থেকে যায় পোপের শাসনাধীন ক্যাথলিক। অপরভাগ প্রটেস্টাণ্ট, কিন্তু পোপের মতো কোনো একজনের শাসনাধীন নয়। বিভিন্ন রাজ্যের প্রটেস্টাণ্ট চার্চ বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর নির্ভর হয়। ইংলণ্ডের চার্চ চলে যায় রাজার রক্ষণাধীনে। তিনি হন ডিফেণ্ডার অভ্ দ্য ফেথ। কিন্তু তিনি যদি নিরঙ্কুশ হন তবে তাঁর উপর অঙ্কুশ প্রয়োগ করবে কে? ইংলণ্ড এর উত্তর দেয়, কেন? পার্লামেণ্ট? অর্থাৎ প্রজাদের প্রতিনিধিসভা। চার্চ আর স্টেট দুটোর উপরেই আধিপত্য করে পার্লামেণ্ট। পার্লামেণ্টের একভাগের নাম হাউস অভ্ লর্ডস্। সেখানে অভিজাতশ্রেণীর ভূস্বামী-দের সঙ্গে আসন গ্রহণ করেন খ্রীস্টীয় সঙ্ঘের গোস্বামীরা। লর্ডস টেম্পোরাল তথা লর্ডস স্পিরিচুয়াল। আরেকভাগের নাম হাউস অভ্ কমনস। সেখানে বসেন জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। প্রধানত ব্যবসাদার শ্রেণীর লোক। যাদের

পরে বলা হয় বুর্জোয়া। অর্থাৎ নাগরিক। ইতিমধ্যে শ্রমিকরাও সেখানে প্রবেশ পেয়েছেন আর দলে ভারী হয়েছেন। ইতিহাস ক্রমেই বামদিকে যাচ্ছে। অব্যক্ত বামা গতিঃ। ইংলণ্ডে সেটা বিপ্লবের রূপ না নিয়ে বিবর্তনের রূপ নিয়েছে। তবে বিপ্লবের রূপ যে একেবারেই নেয়নি তা নয়। রাজার উপরে পার্লামেন্টের জয় নির্বিবাদে ঘটেনি। সশস্ত্র সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত পার্লামেন্টের উপর ট্রেড ইউনিয়নের জয় হয়নি। চরমপন্থীরাও চান পার্লামেন্টকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করতে। শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতার নয় অর্থ নৈতিক ক্ষমতার। কিন্তু তার দেরি আছে।

ইরান এখনো ধর্মীয় সংগঠনের উপর রাষ্ট্রকে জিতিয়ে দিতে পারেনি। ইসলামে চার্চ নেই, কিন্তু মোল্লাতন্ত্র বা উলেমাতন্ত্র রয়েছে। আয়াতোল্লাদের হাতে প্রায় দু'লক্ষ সর্বসময়ের কর্মী। তাঁদের তহবিলে অর্থ যোগায় দেশের বণিকশ্রেণী। বিশেষ করে তেহরানের 'বাজার'। দেশের অসংখ্য মসজিদে তাঁদের ঘাঁটি। রাজার সাধ্য ছিল না তাঁদের সেসব ঘাঁটি থেকে তাঁদের হটিয়ে দেওয়ার। কিংবা তাঁদের জন্যে বণিকদের বরাদ্দ টাকায় হাত দেওয়ার। তবে তিনি চাষীদের স্বার্থে ভূমিসংস্কার করতে গিয়ে মালিকদের স্বার্থে ঘা দিয়েছিলেন। তাদের স্বত্ব খর্ব করেছিলেন। তার ফলে মোল্লাদের ক্ষমতাও খর্ব হয়। তাঁরা বিদ্রোহী হন। অথচ ভূমিসংস্কারের ইস্যুতে নয়। সেটাকে ধামাচাপা দিয়ে শাসনসংস্কারের ইস্যুতে। এমনি করে জনসাধারণের সমর্থন পান। দেশে গণতন্ত্র থাকলে তাঁরা জনসাধারণের ভোটেই তাঁদের দলটাকে জিতিয়ে দিতেন। গণতন্ত্রে রাজার অনীহা ছিল। অভিজাতদেরও অনিচ্ছা ছিল। ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে ইরানী বিপ্লবের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বৈসাদৃশ্য এইখানে যে ক্যাথলিক পাদ্রীরা পোপের প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করেন না, তাই পোপের অনুগত রাজার আনুগত্যও ত্যাগ করেন না। শাসনসংস্কার তাঁদেরও কাম্য ছিল, কিন্তু রাজার বা রাজতন্ত্রের বিনাশ নয়। দেখা গেল বিপ্লবীরা চার্চের বিরুদ্ধে তথা পোপের বিরুদ্ধেও জনতাকে ক্ষেপিয়েছে। চার্চের জমি কেড়ে নিয়েছে।

সেই অধ্যায়টা ইরানে শুরু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আয়াতোল্লারাই অগ্রণী হয়ে তার পথ রোধ করলেন। এতে তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁরাই দল গঠন করে মজলিসে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছেন। নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে দেশের লোকেরই হাতে ভোটাধিকার দিয়েছেন। ভোট পড়েছে তাঁদের দলেরই দিকে বেশী। কিন্তু তাঁদের নতুন সংবিধানও পুরাতন সংবিধানের মতো পার্লামেন্টের উপর একজন

ইমামকে স্থান দিয়েছে। তিনি অনুমোদন না করলে আইনও পাশ হবে না, প্রগতিও হবে না। প্রেসিডেন্টও তাঁরই মনোনীত ব্যক্তি। প্রধানমন্ত্রীও তাঁরই আস্থাভাজন। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মতভেদ হলে যাকে তিনি রাখবেন তিনিই থাকবেন। অপরজনকে বিদায় নিতে হবে। এযাত্রা গেলেন প্রেসিডেন্ট বানী সদর। পরের বার হয়তো যাবেন প্রধানমন্ত্রী। এটাও রাজার খামখেয়ালীর সঙ্গে তুলনীয়। রাজার মর্জির জায়গায় এসেছে ইসলামের মর্জি। রাজনীতির উপর সওয়ার হয়েছে ধর্মনীতি। কত লোকের প্রাণদণ্ড হয়ে গেল রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে নয়, ধর্মদ্রোহের অপরাধে। অর্থাৎ ইমাম বা আয়াতোল্লাদের অমান্য করার অপরাধে। পান থেকে চুন খসলেও ধর্মদ্রোহ। ধর্মের এলাকায় পড়ে যাবতীয় সামাজিক আইন। একে আর ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। কোনো বিপ্লবের সঙ্গেই না। এ এক আজব চিড়িয়া।

স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিনিশ্চয়

সালটা বোধহয় ১৯২৮। স্থানটা ইংলণ্ড। একদিন 'টাইমস' বা 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান' খুলে দেখি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। সেটি ভারতেই প্রদত্ত। যতদূর মনে পড়ে পাঞ্জাবে। এতকাল পরে তার সমস্তটা মনে নেই। যেটুকু মনে দেগে গেছে সেটুকু এই যে মানুষের প্রতি মানুষের ফিজিকাল রিভালসন বা কায়িক ঘৃণা ভারতের লোকদের মজ্জাগত।

অর্থাৎ মানুষ মানুষকে ভিন্ন জাতের বা ছোট জাতের মানুষ বলে ঘেন্না করে। আশ্চর্যের ব্যাপার সে নিজেও তথাকথিত উচ্চতর জাতের দ্বারা ঘৃণিত। এমন কী, একশ্রেণীর ব্রাহ্মণও অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে ঘৃণা করে। অন্তত কিছুদিন আগেও করত।

কিন্তু যে কথাটা রবীন্দ্রনাথ বলেননি সে কথাটাও সমান সত্য। ঘৃণা জিনিসটা দিনের বেলা সকলের সামনে। রাতের বেলা নারীর সঙ্গে অন্ধকার কক্ষে নয়। সে নারী দাসীও হতে পারে, বেশ্যাও হতে পারে, জন্মসূত্রে হাড়িও হতে পারে, ডোমও হতে পারে, চণ্ডালও হতে পারে, ম্লেচ্ছও হতে পারে, যবনও হতে পারে। উচ্চবর্ণীয় পুরুষ তাকে উচ্চবর্ণীয়া নারীর মতোই সাদরে গ্রহণ করে। মানুষটা তো ঘৃণ্য নয়ই, কাজটাও ঘৃণ্য নয়। পুরাণে ইতিহাসে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। দৈনন্দিন জীবনেও এর যথেষ্ট উদাহরণ মেলে।

বিবাহ যেখানে সম্ভব নয় মিলন সেখানে সম্ভব। মিলনের ফলে যেসব সন্তান জন্মায় তারা সাধারণত সমাজেই স্থান পায়, নয়তো তাদের নিয়ে আলাদা একটা জাত সৃষ্টি হয়। সেই জাতের জন্যে একটা পেশাও নির্দিষ্ট হয়। এমনি করে চার বর্ণের থেকে চার হাজার জাতের উৎপত্তি হয়েছে। কে কার চেয়ে বড়ো, কে কার চেয়ে ছোট এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক চার হাজার বছর ধরে চলে এসেছে। যে বড়ো সে ছোটকে ছোঁবে না, তার হাতে খাবে না, তার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক পাতাবে না। তবে ডুবে ডুবে জল খেতে অরুচি নেই। উক্ত ক্রিয়া আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত

অব্যাহত রয়ছে। হিন্দু সমাজ এটা স্বীকারও করে নিয়েছে। হিন্দু আইনে অবৈধ সন্তানকেও সম্পত্তি দানের ব্যবস্থা আছে। অবৈধ সন্তানেরও সম্পত্তি থাকলে বৈধ বিবাহ হয়। কাঞ্চন থাকলে কৌলীন্য পেতে সাধারণত দু' পুরুষের বেশী সময় লাগে না। পিতার পদবীর পরিবর্তে আর একটা গালভরা পদবী জুটে যায়। কিছু টাকা খরচ করলে জাল কুলজীও তৈরি হয়।

আমার ছেলেবেলায় আমার বাবা আমাকে বলেছিলেন, "ভারতে এতগুলো জাত আছে। ইংরেজরা যদি এদেশে থেকে যেত তা হলে আরো একটা জাত বাড়ত। তাতে আমাদের কী ক্ষতি হতো?" অর্থাৎ ভারতীয় সমাজে ইংরেজরাও হতো আরো একটা কাস্ট। কেবল হিন্দু মানস নয়, হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান নির্বিশেষে ভারতীয় মানস মানুষকে কাস্ট অনুসারে ভাগ করতে অভ্যস্ত। সেদিন উত্তরপ্রদেশে ব্যাকওয়ার্ড কাস্টের একটা তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে দেখা গেল বেশ কয়েকটি কাস্ট ধর্মে মুসলমান। মুসলমানরাও যে কাস্ট মানে এটা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। চাষী মুসলমান ও তাঁতী মুসলমান ও জেলে মুসলমান এদের কারো সঙ্গে কারো জ্ঞাতা নেই। অর্থাৎ কেউ কেউ কারো জ্ঞাতি নয়। একই গ্রামে পাশাপাশি দুই মসজিদ। একটি 'গেরস্তিদের', তার মানে চাষীদের। অপরটি 'মোমিনদের', তার মানে জোলাদের। ধীবর বা ধাওয়াদের' মর্যাদা আরো নিচে। অবস্থাও আরো খারাপ।

এটা লক্ষণীয় যে ছোট ও বড়ো বিচার করার সাধারণ মাপকাঠি হচ্ছে সম্পত্তি ও পেশা। কতকগুলি পেশা খুবই নোংরা বা নিন্দনীয়। তেমন অর্থকরীও নয়। যেমন মুচি, মেথর ও মুদ্দফরাসের কাজ। চামার শুনলেই হিন্দুর মনে ঘৃণা জাগে। ওরা মরা গোরু তুলে নিয়ে যায়, চামড়া ছাড়ায়, কেউ কেউ সন্দেহ করে যে মাংসটাও কাজে লাগায়। চণ্ডাল বললে শ্মশানের অনুষঙ্গ মনে আসে। সেকালে ওরাই অপরাধীকে শূলে চড়াত বা তার মাথা কাটত। নিন্দনীয় পেশার মধ্যে একটিই ছিল অর্থকরী। সেটি শৌণ্ডিকের। সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে তাকে জমিদারি কিনতে হতো, প্রাসাদ বানাতে হতো, দান খয়রাত করতে হতো। কসাই বৃত্তিও তেমনি হীন বৃত্তি। আমার আদালতে শহরের বেশ্যারা সাক্ষী দিতে এলে তাদের পেশার ঘরে লেখা হতো 'বেশ্যা' নয়, 'পেশাকার'। লিখতে গিয়ে আমার পেশকারের মুখখানা গম্ভীর হয়ে যেত। জিজ্ঞাসা করতুম, "তোমার নাম কী?" উত্তর পেতুম "পারুল-বালা পেশাকার।" ওটিও একটি নিন্দিত পেশা, মর্যাদায় খাটো, কিন্তু কারো কারো

জীবনে সে পেশা অর্থকরী। প্রাচীন সাহিত্যে গণিকাদের মর্যাদা প্রায় শ্রেষ্ঠীদের অনুরূপ। এটা কেবল প্রাচীন ভারতে নয়, প্রাচীন গ্রীস রোমেও। প্রাচীন তথা আধুনিক জাপানেও। কিন্তু গেইশাদের অধিকাংশই গরিব দুঃখী।

মোটের উপর বলা যেতে পারে. যে যত নিচে সে তত শোষিত, যে যত শোষিত সে তত নিচে। কিন্তু এমনও দেখা গেছে যে পুরোহিত পেশার লোকেরা খেতে পরতে পায় না, কুঁড়েঘরে থাকে, অথচ তাদের হাতেই শাস্ত্র, তাদের সঙ্গেই ঠাকুর-দেবতাদের নিবিড় সম্পর্ক, অন্নপ্রাশন থেকে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত দশকর্ম তাদের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়, তাদের অভিশাপ সর্বনাশা, তাই তাদের ভয় করে রাজাপ্রজা ধনিকশ্রমিক নির্বিশেষে প্রত্যেকটি হিন্দু। ইউরোপেও ভয় করত রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত-কুলকে। তাঁরা ছিলেন দারিদ্র্য ও ব্রহ্মচর্যব্রতধারী। তাঁদের ধর্মগুরু পোপ ইচ্ছা করলে রাজাকে সমাজচ্যুত করতে পারতেন. তখন তাঁর সিংহাসন টলমল করত। তিনি মারা গেলে তাঁর শেষকৃত্য দুষ্কর হতো। বিয়ে করতে চাইলে বিয়ের মন্ত্রই বা পড়াবে কে? ব্যাপটিজম না হলে কেউ খ্রীস্টান বলেই গণ্য নয়। সুতরাং একঘরে। গত কয়েক শতাব্দীতে বার্থ রেজিস্ট্রেশন, সিভিল ম্যারেজ, বৈদ্যুতিক চুল্লীতে ক্রিমেশন প্রভৃতি প্রবর্তিত হয়েছে। পুরোহিতকুলের সে একচেটে পসার আর নেই। কিন্তু তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও মর্যাদা এখনো প্রভূত। কারণ ক্যাথলিক হয়ে থাকলে তাঁরা কামিনীকাঞ্চনত্যাগী। প্রটেস্টান্ট হয়ে থাকলে কাঞ্চনত্যাগী। শোষক শ্রেণী বনাম শোষিত শ্রেণীর ছকের মধ্যে তাঁদের ফেলা যায় না।

মানুষের ইতিহাসে বিভিন্ন দেশে লক্ষিত হয় শাস্ত্র, শস্ত্র ও ধনসম্পদ এই তিনটি যাদের অধিকারে তারাই সমাজের তথা রাষ্ট্রের উপরতলার অধিবাসী। আর-সকলে নিচের তলার। তারা শ্রমজীবী। তারা কৃষিজীবী। তারা সাধারণ পদাতিক সৈনিক। নিচের তলার নিচেও একটা বেসমেন্ট থাকে। সেখানে বাস করে দিনমজুর, ভিক্ষুক, পতিতা, জাতিচ্যুত, মেথর, মুদ্দফরাস, চামার, হিজড়ে প্রভৃতি মানুষ। অবাক কাণ্ড! জাপানেও অস্পৃশ্য জাত আছে। 'সদ্‌গতি' নামক কাহিনীতে প্রেমচন্দ্ একটি চামারের জীবনের ট্রাজেডী এঁকেছেন। তাকে টেলিভিসনে রূপায়িত করেছেন সত্যজিৎ রায়। ওই লোকটি চামার না হয়ে কামার হলে ওর দুর্গতি হতো না। চামার বললেই তার সঙ্গে আসে হিন্দুদের উপাস্য দেবতা গোমাতার সঙ্গে তার ম্লেচ্ছ-সুলভ সম্পর্ক। আর ম্লেচ্ছের প্রতি হিন্দুসমাজ হৃদয়হীন। শুধু ওই ব্রাহ্মণটিকে দোষ দিলে কী হবে? যাদের উত্তরপ্রদেশে 'ঠাকুর' বলা হয় সেই রাজপুতরাই বা

কম কী? খুন জখম পুড়িয়ে মারার মামলাগুলোতে ব্রাহ্মণ রাজপুত যাদব কেউ কারো চেয়ে কম যায় না। দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণদের চেয়ে অব্রাহ্মণদেরই ক্ষমতা বেড়ে গেছে, তাই অত্যাচারও বেড়ে গেছে। সূর্যের চেয়ে বালির তেজ বেশী। স্বাধীনতার পরে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রতাপ কমে গেছে, বৈশ্য ও সৎশূদ্রের প্রতাপ তুঙ্গে উঠেছে সৎশূদ্রেরা আজকাল উপবীত নিয়ে ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়। গোকুলের গোপ-গোপীর নাকি যদুবংশের যাদব-যাদবী। জোত যার জোর তার। জমিদার গেছে। জোতদার এখন গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। দিনমজুর শ্রেণীর হরিজনদের মাথা তুলতে দেখলে তারা মাথা গুঁড়িয়ে দেবে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম গ্রাম থেকে শহরে পলায়ন। শহরে এসে ওরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ফুটপাথে পড়ে থাকে। সেই-খানে আহার নিদ্রা মৈথুন। নতুন এক সমস্যা সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা কি তেমনি নেশন যে স্বেচ্ছায় উপবীত ত্যাগ করব, উপনয়ন ত্যাগ করব, দেব আর দাস বলে সমাজকে দুই ভাগে বিভক্ত করব না? এদেশে দেবদেবীদের এত বেশী প্রভাব যে ছোট বড়ো সবাই চায় দেবদেবী বলে পরিচয় দিতে। মানবমানবী বলে নয়। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর উপর আরো তিপান্ন কোটি দেবদেবী।

আরো গভীরে যেতে হবে। ভারতে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক এসেছে। জাতি অর্থে 'রেস'। 'কাস্ট' নয়। ভারত বরাবরই চেষ্টা করেছে 'রেস'কে 'কাস্ট'-এ পরিণত করতে। কারণ সেইটেই ভারতের কাঠামো। গ্রীক আর পারসিক, শক আর কুশান, হুন আর আহোম, প্রত্যেকেই এক বা একাধিক 'কাস্টে' সামিল হয়ে গেছে। হয়নি কেবল তুর্ক আর মোগল আর পর্তুগীজ আর ইংরেজ। কারণ এরা ধর্মে মুসলমান বা খ্রীস্টান। আমি পার্শী আর ইহুদীদের উল্লেখ করলুম না। তারা মুষ্টিমেয়। তবে হিন্দু সমাজে 'কাস্ট' হিসাবে গণ্য না হলেও তারাও প্রকারান্তরে এক একটি 'কাস্ট'। যদিও তাদের বেলা 'রেস' হিসাবে আইডেনটিটিই শেষ কথা। সেই অভিমান ইংরেজদের বেলাও সত্য, তাই ওরা এদেশে বসবাসই করল না। আমার বাবার থিওরি কাজে লাগল না। তুর্ক, মোগল ও পর্তুগীজ বংশীয়রা এদেশে বসবাস করতে করতে ভারতীয় বনে গেছে, কিন্তু হিন্দু বনেনি। ফলে হিন্দুদের কাস্ট সীস্টেমের সঙ্গে খাপ খায়নি। এই অসামঞ্জস্যের পরিণাম হয়েছে দেশভাগ। তা সত্ত্বেও অসামঞ্জস্য দূর হয়নি। আমাদের অনেকের মতে এর একমাত্র সমাধান কাস্ট সীস্টেম লোপ করা। ডক্টর আম্বেদকার গান্ধীজীকে এই মন্ত্রণা দিয়েছিলেন। তখন অগ্রাহ্য করলেও গান্ধীজীও পরে একই সিদ্ধান্তে উপনীত

হয়েছিলেন। তিনিও চেয়েছিলেন 'কাস্টলেস সোসাইটি'। তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত ছিল, **"Caste is a form of graded untouchability."**

তার মানে প্রেমচন্দের ওই চামারটিও আরো নিচু জাতের বেলা অস্পৃশ্যতা মানে। বিয়ে সাদীর বেলা সেটা প্রকট হয়। জ্ঞাতি ভোজনের বেলাতেও। চামার যদি শহরে গিয়ে কলমজুর হয় কেউ তাকে চামার বলে চিনতে পারবে না, সে অনায়াসে জলচল হবে, কিন্তু গ্রামের গোরু মারা গেলে সৎকার করবে কে? চামড়া ছাড়াবে কে? চামড়ার ব্যবসা মার খাবে না? একই কথা খাটে মেথর মুদ্দফরাস প্রভৃতির বেলা। হিন্দুসমাজের চিরচরিত শ্রমবিভাগ বিপর্যস্ত হবে। গ্রামীণ অর্থনীতি ক্ষতি-গ্রস্ত হবে। হরিজন সমস্যার মোক্ষম সমাধান হচ্ছে ভারতের শিল্পায়ন। ভারতকে আর একটা রাশিয়ায় বা আমেরিকায় বা জাপানে পরিণত করা। কিন্তু পরে হয়তো মালুম হবে যে রোগটার চেয়ে দাওয়াটাই আরো খারাপ। হরিজন হবে প্রোলিটারিয়ান, কিন্তু ক'জন প্রোলিটারিয়ান নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতম স্তরে ওঠবার সুযোগ পাবে? তখন ওরা সবাই মিলে একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাবে। চীনদেশে তেমন বিপ্লব সফল হয়নি। ভারতে কি হবে?

'সদ্গতি'র মতো ঘটনা বাংলাদেশে ঘটতে পারত না। বাংলাদেশ বলতে আমি অবিভক্ত বাংলার কথাই বলছি। এখানে প্রত্যেকটি জাতের নিজস্ব 'ব্রাহ্মণ' আছে। নমঃশূদ্রদের 'ব্রাহ্মণ'রাও অন্তত পঞ্চাশ বছর আগে থেকে মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, লাহিড়ী, ভাতুড়ী ইত্যাদি পদবী ধারণ করেছেন। এঁরাও উপবীতধারী। উপবীত আজকাল কে না নিচ্ছে? বাংলাদেশে কেবল ব্রাহ্মণদেরই উপবীত ছিল, আর-কোনো জাতের ছিল না। গত শতাব্দীতে বৈদ্যরাও উপবীত ধারণ করেন, এ শতাব্দীতে কায়স্থরাও, এঁদের দেখাদেখি অন্যান্য জাত। একদিন এক স্কুল পরিদর্শন করতে গিয়ে শুনি মাস্টার মশায়ের পদবী নৈ শর্মা। সেন শর্মা, দাশ বর্মা এঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, কিন্তু নৈ শর্মা? আজকাল কাউকে তার জাত নিয়ে প্রশ্ন করা অভদ্রতা। তখনকার দিনে অভদ্রতা ছিল না। মাস্টার মশায়কে জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্তু সেক্রেটারি মশায়কে করেছি। উত্তর পেয়েছি, নাপিত। নাপিতরা আর নাপিত নয়, ওরা নৈ। নবশাখ নয়, ব্রাহ্মণ। অতএব শর্মা। ঘটনাটা ১৯৩৫ বা ৩৬ সালের। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। ব্রাহ্মণের ছেলে ছুতোরমিস্ত্রির কাজ করছে দেখলে আজকাল কেউ আশ্চর্য হয় না, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ছুতোরমিস্ত্রিকে তার নাম জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পাওয়া যাবে শ্রীঅমুকচন্দ্র

শর্মা। তাঁরও উপবীত আছে। শর্মার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বর্মার সংখ্যাও অগণ্য। সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক উন্নতির নানান দরজা খুলে গেছে। জাত ব্যবসা ছাড়াও অন্য ব্যবসা করা চলে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ সবাই তাই করছেন। অতএব কামার, কুমোর, ছুতোর কেন করবে না? মহাত্মা গান্ধী যাঁদের হরিজন বলে চিহ্নিত করে-ছিলেন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁদের তফশীলভুক্ত করে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিয়ে যান। স্বাধীনতার পরেও তাঁরা তেমনি তফশীলভুক্ত কিন্তু 'হরিজন' শব্দটা তাঁদের পক্ষে অসম্মানকর। তাঁরা এখন যে যার জাত রক্ষা করে পৈতে নিয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বর্ণভুক্ত হতে তৎপর। অর্থাৎ তাঁরাও দ্বিজ। পঞ্চাশ বছর বাদে শূদ্র বলে কেউ থাকবে না। চারটি বর্ণের একটি অচলিত হবে।

তার মানে কি কাস্ট অদৃশ্য হবে? কাস্ট অদৃশ্য হওয়া দূরে থাক, কাস্ট ওয়াব নানা স্থানে দেখা যাচ্ছে। যে যার কাস্ট রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। সেটাই তার আইডেনটিটি। হিন্দুর যখন জাত যায় বৈষ্ণব হয়। কালক্রমে বোষ্টমও একটা কাস্ট। জৈনদের মধ্যে, বৌদ্ধদের মধ্যে, শিখদের মধ্যেও কাস্ট আছে। খ্রীস্টান, মুসলমানদের মধ্যেও। আমার এক সহকর্মী বলেন, "আমরা রাজপুত মুসলমান।" ওঁরা আর কোনো মুসলমানদের সঙ্গে বিয়ে সাদী করেন না। কিন্তু অবাক কাণ্ড তাঁদেরি হিন্দু রাজপুত জ্ঞাতিদের সঙ্গে করেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের জলন্ত প্রতিবাদ। এক মুসলমান সহযাত্রী আমার জামাতাকে বলেছিলেন, "আমরাও গোত্র মানি। বাপ যখন মারা যান তখন ছেলেকে বলে যান গোত্রের নাম।" সমাজে ওটা গোপন রাখা হয়।

আমার নিজের ধারণা ট্রাইব ছিল সকলের আগে, তার পরে এল কাস্ট, তার পরে এল বর্ণ। এল শ্বেতকায় আর্যভাষী বিদেশীদের সঙ্গে। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে 'আর্য' বলে কোনো একটা 'রেস' ছিল না। কিন্তু 'আর্য' বলে একটি ভাষাগোষ্ঠী ছিল। আমরা এতদিন একটা ভ্রান্তি পোষণ করে এসেছি। 'আর্য' আর 'অনার্য' বলে দুটো ভাষাগোষ্ঠী ছিল। দুটো 'রেস' ছিল না। সব দেশে যেমন দেখা যায় এদেশেও তেমনি। বিদেশীরা বিজেতা হয়ে শাসন যন্ত্র দখল করে বসে। ওদের সঙ্গে আসে একদল বণিক। তারা ব্যবসা বাণিজ্য করে। আসে একদল ধর্মপ্রচারক। তারা নেটিভদের ধর্মান্তরিত করে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ এই তিনটি শাখা কেবল ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও দেখা গেছে। দেশভেদে নাম ভিন্ন। এই তিনটি শাখাই এদেশে তিনটি বর্ণ বলে অভিহিত হয়। এই তিন বর্ণেরই

উপবীত ধারণে অধিকার। এরাই দ্বিজ। আগে থেকে যারা ছিল সেই নেটিভরা হলো শূদ্র। অর্থাৎ ক্ষুদ্র। অর্থাৎ ছোটলোক বা ছোট জাত।

কিন্তু 'নেটিভরাও' তো সবাই সমান ছিল না। তাদের মধ্যে ছিল আরো পুরাতন স্তরভেদ। একেবারে নিচের স্তরে যারা ছিল তারাই আদিম, আদিম বলেই অন্ত্যজ। দক্ষিণ ভারতে এমন কয়েকটি জাত আছে যারা শুধু অস্পৃশ্য নয়, অদৃশ্য। তাদের মুখ দেখতে নেই। তারা যদি মুখ দেখাতে যায় তবে কঠোর সাজা পায়। ভারতে আর্যভাষীদের আগমনের পূর্বেই এদেশের সমাজব্যবস্থায় ট্রাইব ছিল, কাস্ট ছিল, অস্পৃশ্যতা ছিল, অদৃশ্যতা ছিল। সে সমাজের নাম কী ছিল কেউ জানে কেউ জানে না। তাকে হিন্দু সমাজ বলা শুরু হয় ইসলামধর্মী আরব ও তুর্কদের সমাজের থেকে পৃথক করতে। এরাও তিন শাখায় বিভক্ত। একদল রাজত্ব করে, একদল বাণিজ্য করে, একদল ধর্মপ্রচার করে। এরাও একপ্রকার দ্বিজ। এদের বলা হয় আশরাফ। ধর্মান্তরিত 'নেটিভ' মুসলমানরা আতরাপ। প্রকারান্তরে শূদ্র বা ছোটলোক। এর পরে আসে ইংরেজ ফরাসী পর্তুগীজরা। এরাও তিন শাখায় বিভক্ত। শাসক, বণিক, ধর্মপ্রচারক। এরাও একপ্রকার দ্বিজ। ধর্মান্তরিত 'নেটিভ' খ্রীস্টানরা প্রকারান্তরে শূদ্র বা ছোটলোক। শ্বেতাঙ্গরা গেছে, আশরাফরা আছে, দ্বিজরা আছে।

আগন্তুকরা সঙ্গে করে যথেষ্টসংখ্যক নারী নিয়ে আসত না। সেকালে পথঘাট ছিল বিপৎসঙ্কুল। নারী হরণের আশঙ্কা ছিল। এদেশে এসে আর্যভাষীরা নারীর অভাব অনুভব করেন। কখনো বৈধভাবে, কখনো অবৈধভাবে দেশীয় নারীর সঙ্গে মিলিত হন। আরব, তুর্ক ও মোগলদের বেলাও তাই। ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজদের বেলাও তাই। এটা একটা 'লৌহ নিয়ম' (Iron Law), এ নিয়ম সর্বত্র সক্রিয়। একে অতিক্রম করার জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গরা আপার্টহাইড (apartheid) প্রবর্তন করেছে। কিন্তু তার তিন শতাব্দী পূর্বেই রক্তের মিশ্রণ শুরু হয়ে গেছে। আমাদের পূর্বপুরুষরাও রক্তের মিশ্রণ রোধ করার জন্যে এক-প্রকার আপার্টহাইড প্রবর্তন করেছিলেন। কারা থাকবে গ্রামের বা শহরের ভিতরে, কারা বাইরে। কারা থাকবে কোন্ পাড়ায়, কোন্ মহল্লায়। এসব আমি দেশীয় রাজ্যে ছেলেবেলায় চাক্ষুষ করেছি। ব্রাহ্মণদের বসতির নাম 'ব্রাহ্মণ শাসন'। সেখানে ঢুকতে ভয় করত। আমার এক প্রাইভেট টিউটরের আমন্ত্রণে তাঁর অতিথি হয়েছি। কটকের কাছে একটি 'ব্রাহ্মণ শাসন' আছে, সেখানে এখনো অব্রাহ্মণদের প্রবেশ

নিষেধ। একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে রজক। সে কাপড় কাচতে নিয়ে যায়, কেচে দিয়ে যায়।

পৃথিবীতে সব চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে ভারতের হিন্দুদের আপার্টহাইড। এর জন্যে দায়ী শুধু ব্রাহ্মণরা নয়, দায়ী ক্ষত্রিয় বৈশ্যরাও, দায়ী উচ্চশ্রেণীর শূদ্ররাও। উদারতা যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেটুকু ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস ও রেফরমেশনের কল্যাণে। সেইসঙ্গে শিল্পায়ন তথা নগরায়নের প্রভাবে। নারীজাগরণ ও শূদ্রজাগরণ যদি অব্যাহত থাকে আমূল পরিবর্তন আশা করতে পারি। স্ত্রীশূদ্রকে অবদমিত রাখাই ছিল শাস্ত্রকার ও শস্ত্রধারীদের চিরাচরিত নীতি ও রীতি। এতে স্ত্রীশূদ্রও সহযোগিতা করেছিল। বিদ্রোহের বা বিপ্লবের কথা পুরাণে ইতিহাসে লেখে না। প্রতিরোধ না করলে সব অন্যায়ই চিরস্থায়ী হয়। তখন তাকে বলা হয় ধর্মের অঙ্গ।

উদ্‌ভট

আমার যৌবনকাল কেটেছে ইউরোপীয় লিবারলদের আকাঙ্ক্ষিত প্রগতিশীল বিশ্বের ধ্যানধারণায়। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে টলস্টয়, রাস্‌কিন, থোরো, গান্ধীর ইউটোপীয় আদর্শবাদ ও তার রূপায়ণের পরিকল্পনা। কিন্তু অস্তাচলের প্রান্ত থেকে উদয়াচলে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখছি একটার পর একটা উদ্‌ভট এসে ইতিহাসের মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে। যার কোনো বাস্তব ভিত্তি ছিল না তাই হয়েছে বাস্তব।

আমার মুসলমান বন্ধুরা কি কেনোদিন ভাবতে পেরেছিলেন যে ইংরেজ চলে গেলে তাঁদের দিয়ে যাবে পাকিস্তান বলে স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্র? যখন ভাবতে আরম্ভ করেন তখনো তাঁদের কাম্য ছিল হিন্দু মুসলমানের সমঝোতা ও সহ-অবস্থান। ভারতীয় মুসলমানরা একাই একটা নেশন হবে ও পাকিস্তান হবে সেই নেশনেরই একার বাসভূমি এতদূর যেতে আমার পরিচিত কেউ রাজী ছিলেন না। কারণ সেক্ষেত্রে তাঁদের সবাইকেই 'হিন্দুস্থান' থেকে বিদায় নিয়ে যেতে হতো 'পাকিস্তানে'। এমন নির্বোধ কেউ ছিলেন না যে সত্যি সত্যি লোকবিনিময় ঘটিয়ে কলকাতাকে হিন্দুশূন্য আর দিল্লীকে মুসলিমশূন্য করতেন।

অথচ ঠিক এই জিনিসটিই হতে যাচ্ছিল দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে, যদি না কলকাতা পড়ে যেত 'হিন্দুস্থানে' ও যদি না গান্ধীজী প্রথমে কলকাতায় ও পরে দিল্লীতে লোক-বিনিময়ের বিরুদ্ধে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করতেন ও আক্ষরিকভাবে প্রাণপাত করতেন। পাকিস্তান এমননিতেই একটা উদ্‌ভট তত্ত্ব। লোকবিনিময় তার চেয়েও উদ্‌ভট। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উদ্‌ভট হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র। যার নজীর ভারতের ইতিহাসে নেই। ভারতের লোক মুসলিম রাজত্বে দীর্ঘকাল বাস করেছে, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো-দিন বাস করেনি। মাঝে মাঝে জিজিয়া কর ধার্য করা হয়েছে, কিন্তু হিন্দুরা প্রতিবাদ করলে সুলতান ও বাদশারা সেটা রহিত করেছেন। সৈন্যদলে হিন্দুদেরও নেওয়া হয়েছে। সেনাপতির পদও দেওয়া হয়েছে। অথচ কাউকে ইসলামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে বলা হয়নি। আনুগত্য বরাবরই রাজার কাছে।

তা তিনি হিন্দুই হোন আর মুসলমানই হোন। রাজাও প্রজার কাছে অপর কোনো আনুগত্য দাবী করেননি। কাউকে বলেননি যে রাজার উপরেও রাজধর্মের প্রতি অনুগত হতে হবে। সেটা ছিল রাজার ব্যক্তিগত আনুগত্য। ইসলাম এদেশের রাজধর্ম হলেও 'স্টেট রিলিজন' হয়নি। হলো পাকিস্তানী আমলেই।

আমরা এই উদ্ভটের পালটা উদ্ভটকে মঞ্চে নামাইনি। হিন্দুপ্রধান ভারত-রাষ্ট্রকে 'হিন্দু নেশনে'র একার রাষ্ট্র বানাইনি, ভারতকে করিনি হিন্দুদের একার বাসভূমি। 'হিন্দু নেশন' নামক তত্ত্বটাকেই অস্বীকার করেছি। তবে এটাও সত্য যে পালটা উদ্ভট এই ভূখণ্ডেও সক্রিয়। হিন্দী ও মরাঠী ভাষায় ইংরেজী 'নেশন' শব্দটির পারিভাষিক শব্দ জাতি নয়, 'রাষ্ট্র'। 'হিন্দু রাষ্ট্র' বলতে বোঝায় 'হিন্দু নেশন'। 'রাষ্ট্রভাষা' বলতে বোঝায় 'ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ'। নেশন আর স্টেট সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিভ্রান্তির পরিণাম অশুভ। 'হিন্দ্, হিন্দু, হিন্দী' এই ত্রিমূর্তি ইতিমধ্যেই প্রভূত ক্ষতি করেছে। আরো করবে, যদি না হিন্দুরাষ্ট্রবাদীরা নিরস্ত ও নিরস্ত্র হয়।

কিন্তু হবার সম্ভাবনা কতটুকু, যদি না পাকিস্তান সেকুলার হয়? পাকিস্তান সেকুলার হওয়া দূরে থাক দিন দিন উৎকটভাবে ইসলামী হচ্ছে। তার প্রেরণা আসছে ইসলামী দুনিয়া থেকে। চারদিকে ইসলামের পুনর্জাগরণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পাকিস্তান তার ব্যতিক্রম নয়। এটাও উদ্ভট। এই ইসলামী পুনর্জাগরণ। ইসলামিক রিভাইভাল। এটা ইউরোপীয় অর্থে রেনেসাঁস তো নয়ই, রেফরমেশনও নয়। মানুষ ফিরে যেতে চাইছে তেরো শ' বছর আগে। হজরত মহম্মদের যুগে। চার খলিফার যুগে। যেন ইচ্ছা করলেই বৃদ্ধবয়সে যৌবনে ফিরে যাওয়া যায়। যৌবনের তেজ বীর্য সর্বাঙ্গে অনুভব করা যায়। একদিন মোহভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। পেট্রলের অর্থে এরা হঠাৎ বড়লোক হয়েছে, কিন্তু যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেই টের পাবে যে সেকালের সেই দিগ্বিজয়ের পরিবর্তে ঘটবে পরাজয়। ইতিমধ্যে ক্ষুদ্রকায় ইসরায়েলের সঙ্গে যতবার যুদ্ধে নেমেছে ততবার হেরেছে। কারণ ইসরায়েল আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানে তথা অর্থনীতিতে বহুদূর অগ্রসর, কেবল অস্ত্রশস্ত্রেই নয়। ইসরায়েল আধুনিক ইউরোপের অঙ্গ। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের উত্তরাধিকারী। তবে রেফরমেশন থেকে বঞ্চিত। সেইদিক থেকে ইসরায়েলও উদ্ভট।

পৃথিবীতে ইহুদীদের মতো প্রগতিশীল কে? কিন্তু তাদের মধ্যেও একটা পিছুটান ছিল। দু'হাজার বছর ধরে তারা প্রতিদিন প্রার্থনা করে এসেছিল যে

তাদের নিজেদের দেশে তারা আবার ফিরে যাবে ও নিজেদের রাষ্ট্র আবার ফিরে পাবে। তাদের প্রার্থনা সত্যি সত্যি সফল হলো বিংশ শতাব্দীতে এসে। দুই মহাযুদ্ধেই তারা ছিল মিত্রশক্তির সহায়ক। তাই মিত্রশক্তির জয়ের শরিক। মিত্রশক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থনে তারা ইসরায়েল রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। ইতিহাসে এমনতরো উদ্ভট কেউ কখনো দেখেনি। দু'হাজার বছর পরে পলাতকরা ফিরে এসে আবার রাজা হয়েছে।

ইহুদীদের 'হোমল্যাণ্ড'র অনুকরণে এসেছে লীগপন্থী মুসলিমদের 'হোমল্যাণ্ড'। ইহুদীদের নিজস্ব রাষ্ট্র ইসরায়েলের অনুকরণে এসেছে লীগপন্থী মুসলিমদের 'নিজস্ব' রাষ্ট্র পাকিস্থান। এক উদ্ভটের থেকে আরেক উদ্ভট। ইতিহাসের এই উদ্ভট পরম্পরার নবতম আবির্ভাব ইরানের ইসলামী বিপ্লব। রেনেসাঁস নয়, রেফরমেশন নয়, রেভোলিউশন। ইতিহাসের বহুদেশেই বিপ্লব ঘটেছে। তার সাধারণ লক্ষণ রাজবংশের বিতাড়ন বা রাজতন্ত্রের বিলোপ। প্রজাতন্ত্রের প্রবর্তন। কিংবা তার বিশেষ লক্ষণ রাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মসঙ্ঘেরও পতন। ফরাসী বিপ্লব চার্চকেও ক্ষমতাচ্যুত ও সম্পত্তিচ্যুত করে। ঈশ্বরের জায়গায় বসায় যুক্তির দেবীকে। অন্ধ-বিশ্বাস নয়, বিজ্ঞানসিদ্ধ যুক্তিই হয় জীবনের নিয়ামক। আইনকানুন সব উল্টে যায়। শিক্ষায় নবযুগ আসে। ফরাসী বিপ্লব দেশে ও বিদেশে যুগান্তর ঘটায়। সে বিপ্লব ব্যর্থ হলেও তার উত্তরাধিকারী হয় রুশ বিপ্লব। রাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে চার্চেরও অন্তর্ধান ঘটে। তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। ঈশ্বরের জায়গায় কিন্তু যুক্তির দেবীকে বসানো হয় না। রুশ বিপ্লবীরা আরেকপ্রকার অন্ধবিশ্বাসী। তাঁদের 'শাস্ত্র' মার্কস লিখিত সুসমাচার। সেই তাঁদের জীবনের নিয়ামক।

বিপ্লবের যে নজীর ফ্রান্সে ও রাশিয়ায় স্থাপন করা হয়েছে তার সঙ্গে ইরানের ইসলামী বিপ্লবের মিল এইটুকুই যে রাজবংশকে তথা রাজতন্ত্রকে উৎখাত করা হয়েছে। কিন্তু চার্চের অনুরূপ যে মোল্লাতন্ত্র তার গায়ে বা তার সম্পত্তির গায়ে হাত দেওয়া হয়নি। উল্টে মোল্লাতন্ত্রই সর্বশক্তিমান হয়েছে। সবার উপরে ইমাম সত্য তাঁহার উপরে নাই। আয়াতোল্লা খোমেইনী যা বলবেন তাই কোরানবাক্য। আর যা কোরানবাক্য তাই ধ্রুবসত্য। কেবল ধর্মীয় ব্যাপারে নয়, যাবতীয় মানবিক ব্যাপারে। ইরান জোর কদমে এগিয়ে চলেছে তেরোশ' বছর পেছনে। তার অগ্রগতি মানেই পশ্চাদ্গতি। এমনতরো বিপ্লব কি কেউ কোনোদিন দেখেছে? ইরানের ইসলামী বিপ্লবের বিশেষণ পদটি যদি বিশেষ্যপদটির চেয়ে প্রবলতর হয় তবে

বিপ্লব ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হবে। পেট্রল যেই নিঃশেষিত হবে ইরানের নবকলেবরের দম ফুরিয়ে যাবে। ভাগ করবার মতো ধন থাকবে না। শ্রমিক কৃষকের ভাগে যথেষ্ট পড়বে না। আর যদি বিশেষ্য পদটিই প্রবলতর হয় তবে বিশেষণ পদটির মহিমা থাকবে না। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্তই হবে, পার্লামেণ্ট ও গভর্নমেণ্ট চলে যাবে তাদের নাগালের বাইরে। আদালতও তাদের আঁচলমুক্ত হবে। ব্যাঙ্ক ইত্যাদির উপর তাদের খবরদারী খাটবে না। ট্রেড ইউনিয়নের উপরেও না।

জনতার সাহায্য না পেলে সম্রাটকে সরানো যেত না। ইসলামের সাহায্য না নিলে জনতাকে জাগানো যেত না। এইদিক থেকে বিচার করলে ইরানের বিপ্লবের একটা অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু সেটা অর্থহীন হয়ে যায় যখনি শুনি বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির দরজা বন্ধ। যেহেতু সেখানে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা হয়। তার চর্চা যদি হয় তবে মানুষের অন্ধবিশ্বাসে আঘাত লাগে। কোন্‌দিন কে বলে বসবে পৃথিবীটা গোল আর সেটা নাকি সূর্যের চারদিকে ঘুরছে? কী সর্বনেশে কথা! কোরানের সৃষ্টিতত্ত্ব আর বিজ্ঞানের সৃষ্টিতত্ত্ব পরস্পরবিরোধী। কোন্‌টা শেখানো হবে? এর উপর নির্ভর করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ভবিষ্যৎ। আয়াতোল্লা নাকি বলেছেন যে অমন শিক্ষার কোনো দরকার নেই যা ধর্মের সঙ্গে বেখাপ। এ সেই মনোভাব যা হাজার বছর আগে আরবদের জ্ঞানের বর্তিকা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেয়। মাদ্রাসার যুগ যদি ফিরে আসে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ অতীত হবে। ইরানের সেই আগামী অন্ধকার যুগকে বিপ্লবের যুগ বলতে আমার বাধবে। বস্তুত এটা রেভোলিউশনই নয়, এটা রিভাইভাল। এই গেল তিন রকম উদ্‌ভট। এর কোনোটির জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলুম না। অথচ তিনটিই কেমন করে সম্ভব হলো। বিশ্লেষণ করলে উদ্‌ভটকেও অহেতুক বলা চলে না। যে তিনটির উল্লেখ করেছি সে তিনটির পেছনে ছিল বহুবিধ কারণ। তথা বহুজনের সমর্থন। তা ছাড়া বহু শক্তির সম্মিলন বা ঘাতপ্রতিঘাত। ইসরায়েল বা পাকিস্তান বা ইরানের ইসলামী বিপ্লব কোনোটিই অহেতুক বা জনসমর্থনহীন বা চতুর্দিক থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ভারত স্বাধীন না হলে পাকিস্তান কখনো সম্ভব হতো না। ভারতের স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী ছিল বলেই পাকিস্তানও সম্ভব হলো। প্রথম মহাযুদ্ধে তুর্করা জড়িয়ে না পড়লে ও হেরে না গেলে ইংরেজরা প্যালেস্টাইন অধিকার করত না। বাইরে থেকে ইহুদীরা গিয়ে জড়ো হতো না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জয়ী হলেও ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে সৈন্য অপসরণের সিদ্ধান্ত নেয়। জার্মানীর আধখানা সোভিয়েট সৈন্য

দখল করে থাকায় বাকী আধখানায় সৈন্য মোতায়েনের দায় বর্তায় ইংরেজ, ফরাসী ও আমেরিকানদের উপর। ফলে প্যালেস্টাইনে যে পাওয়ার ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হয় তার সুযোগ নেয় ইহুদীরা। নইলে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো না।

ইরানের শাহ্ দেশকে রাতারাতি আধুনিক ও শিল্পায়িত করতে গিয়ে ধনীদের আরো ধনী ও দরিদ্রদের আরো দরিদ্র করেছিলেন। মধ্যবিত্তরাও বেকার। বিদ্রোহের জলতরঙ্গ রোধ করার সাধ্য তাঁর সৈন্যদলের ছিল না। বিদ্রোহকে নেতৃত্ব দেন ধর্মগুরু খোমেইনী। তিনি নিঃস্বার্থ। তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয়। তিনি অসমসাহসী। তাঁর আজ্ঞায় প্রাণ দিতে ছুটে যায় লক্ষ লক্ষ জনের জনতা। তা দেখে সৈন্যদের মন যায় না গুলী চালাতে। তারা অস্ত্রত্যাগ করে। হ্যাঁ, এটাই বিপ্লবের অজ্ঞাতপূর্ব মুহূর্ত। এই মুহূর্তটিই স্থির করে দিল যে সম্রাটের ইচ্ছা নয়, ধর্মগুরুর ইচ্ছাই চূড়ান্ত। আর সে ইচ্ছা জনগণেরও ইচ্ছা।

খোমেইনী অহিংসাবাদী নন। তাঁর পরিচালনাধীন জনতাও অহিংস নয়। একথা মানতে হবে যে সম্রাটের শক্তিশালী সৈন্যদলের সম্মুখীন হওয়ার মতো সামরিক শক্তি তাঁর ছিল না। তাঁর যে শক্তি তা নৈতিক শক্তি। তাঁর জয় নৈতিক জয়। কিন্তু তাঁর জয়লাভের পর যেসব ব্যাপার ঘটেছে সেসব প্রচণ্ডভাবে সহিংস। এর একমাত্র সাফাই বিপ্লবের সময় অমন রক্তপাত তো যে কোনো দেশেই ঘটে থাকে। ফ্রান্সে ঘটেনি? রাশিয়ায় ঘটেনি? চীনে ঘটেনি?

কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রশ্ন থেকে যায় এ কী ধরনের বিপ্লব যার নীট ফল রাজতন্ত্রের শূন্যতাপূরণের জন্যে মোল্লাতন্ত্র? ইতিহাস কি মোল্লাতন্ত্রকে চিরদিন সহ্য করবে? আবার কি শূন্যতা সৃষ্টি করবে না? তখন সে শূন্যতা পূরণ করবে কোন্ তন্ত্র? গণতন্ত্র? সমাজতন্ত্র? আপাতত ইরানই একমাত্র মোল্লাতন্ত্রী দেশ। অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলি হয় রাজন্যশাসিত, নয় সেনানীশাসিত, নয় রাজনীতিকশাসিত। মনে হয় না যে রাজন্যরা বেশীদিন থাকবেন। তাঁরা চলে গেলে কোথাও কর্তৃত্ব করবেন সেনাপতিরা, কোথাও দলপতিরা। মোল্লাদের জন্যে শূন্যতা সৃষ্টি হবে আর কোন্ দেশে? ইরানই বোধ হয় একমাত্র দৃষ্টান্ত।

সব চেয়ে উদ্‌ভট হচ্ছে ইরানী ছাত্রদের দ্বারা মার্কিন দূতাবাস অবরোধ ও দূতদের বন্দিত্ব। তারা অন্য কারো আদেশ চায়নি বা পায়নি। যা করেছে নিজেদের উদ্যোগে করেছে। সমর্থন করেছে দেশের লোক, অনুমোদন করেছেন ধর্মগুরু, স্বীকার করে নিয়েছেন সরকার। আন্তর্জাতিক আইন যদি কেউ না মানে তবে শাস্তিদানের ক্ষমতাই

নেই আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থার। তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়া যায়। কূটনৈতিক সম্পর্কও ছিন্ন করে দেওয়া যায়। সর্বপ্রকার শান্তিপূর্ণ প্রয়াস ব্যর্থ হলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। আমেরিকা যুদ্ধে নামলে রাশিয়াও নামবে। ওরা হয়তো নিজেদের মধ্যে আপস করে ইরানকে দু'ভাগে দখল করবে। যেমন করেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। ইরানীদের শুভবুদ্ধি তাদের রক্ষা করুক।

শিখ প্রসঙ্গ

আমার ছেলেবেলায় আমাদের দেশীয় রাজ্যে নানা ধর্মের ও নানা প্রদেশের মানুষ দেখেছি। আমার নিচের ক্লাসে পড়ত বলদেও সিং। পাঞ্জাবী শিখ। তার বাবা ফরেস্ট অফিসার পৃথ্বী চাঁদ কিন্তু শিখ নন, হিন্দু। তার মা হিন্দু নন, শিখ। ধর্মমত এক নয়, কিন্তু মতবিরোধও নেই।

'শিখ' কথাটি সংস্কৃত শিষ্য শব্দের স্থানীয় উচ্চারণ। হিন্দীতেও মূর্ধণ্য ষ লোক-মুখে হয়ে যায় খ। পণ্ডিতদের মুখেও তাই। পাটনা কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক রামাবতার শর্মা 'ষষ্ঠ' বলতে গিয়ে বলতেন 'খষ্ঠ'। বাংলা পদাবলীতে 'বৃষভানু নন্দিনী' থেকে 'বৃখভানু নন্দিনী'। য ফলাতেও হসন্ত দিলে 'শিষ্য' হয়ে যায় 'শিখ'। কার শিষ্য? গুরুজীর শিষ্য। তাঁরা গুরুবাদী। তাঁদের উপসনার স্থান 'গুরুদ্বার'। তাঁরা বেদকে তাঁদের আদিগ্রন্থ বলে মানেন না। তাঁদের আদিগ্রন্থ হচ্ছে 'গ্রন্থসাহেব'। তাতে বিভিন্ন ধর্ম থেকে সদুক্তি সঙ্কলিত হয়েছে। তাঁদের আর কোনো ধর্মপুস্তক নেই। গীতা উপনিষদ্ প্রভৃতি অসংখ্য হিন্দু শাস্ত্র তাঁদের কাছে অভ্রান্ত নয়। আছেন একমাত্র অলক্ষ্য বা অলখ নিরঞ্জন। তার কোনো আকার নেই। তিনি কালাতীত বা অকাল। তাঁর ভক্ত 'অকালী'। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর অস্তিত্ব নেই। সৎ শ্রী অকাল। 'সৎ' অর্থ যিনি আছেন। দেবদেবী যখন নেই তখন তাঁদের অবতার থাকবেন কী করে? শিখরা বর্ণাশ্রম ধর্ম মানেন না। ব্রাহ্মণ প্রাধান্য মানেন না, উপবীত ধারণ করেন না। দশম গুরু গোবিন্দের অনুশাসনে পুরুষেরা প্রত্যেকেই ধারণ করে সিংহ পদবী আর কেশ, কঙ্গী, কড়া, কাচ্ছা অর্থাৎ কৌপীন আর কৃপাণ। কঙ্গী মানে চিরুণী, কড়া মানে বালা। যার থেকে এসছে হাত কড়া।

শিখরা দীক্ষা দিয়ে মুসলমানকেও শিখ করে নেন। তার সঙ্গে বিয়ে সাদী করেন। মুসলমান তাঁদের কাছে ম্লেচ্ছ বা যবন নয়। অথচ মুসলমানদের সঙ্গেই তাঁদের সব চেয়ে বেশী ঝগড়া। মূল কারণ শিখরা মুসলমানদের শিখ ধর্মে দীক্ষা দিয়ে দল ভারী করলে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিপন্ন। সন্ত ফতে সিং ছিলেন জন্মত মুসলমান। শিখ

ধর্মে দীক্ষা নিয়ে পরে একজন সন্ত বলে মান্য হন। মাস্টার তারা সিং ছিলেন জন্মত ব্রাহ্মণ। তিনি কিন্তু সন্ত বলে গণ্য নন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি একজন শিখ অফিসারের স্ত্রী ছিলেন জন্মত মুসলমান। পরে শিখ ধর্মে দীক্ষা নেন। তাঁদের কন্যাকে বিবাহ করেন এক বাঙালী ব্রাহ্মণ অফিসার। আর যায় কোথা! তাঁর মা বাবা তাঁকে ত্যাজ্য পুত্র করেন। ছোট ছেলেকে দেখিয়ে বলেন, এটিই আমাদের একমাত্র ছেলে। মুখে হাসি নেই, মনে শান্তি নেই, প্রভূত ঐশ্বর্য সত্ত্বেও অসুখী। বাঙালী ব্রাহ্মণ অফিসার শিখ হননি। শিখরা কী মনে করে, জানিনে। তবে এ বিষয়ে শিখ সমাজ চিরদিন উদার। বাজপেয়ীজীর বাড়ীতে তাঁর শিখ সম্বন্ধীদের অবাধ গতিবিধি। স্বামীকে শিখ ধর্মে দীক্ষা নিতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। পৃথ্বী চাঁদের বেলাও ছিল না। মোনা শিখরা তো কেশও বাড়তে দেন না, দাড়ি গোঁফ কামান, বালা পরেন না, কৃপাণ ধরেন না। কাচ্ছা সম্বন্ধে আমি খোঁজ রাখিনে। তবে ইদানীং গোঁড়ামি বেড়ে যাচ্ছে। ইউরোপে আমেরিকায় বসবাস করেও শিখরা সব ক'টি বিধিনিষেধ মানে ও তাই নিয়ে ঝগড়া করে।

গুরু নানকের বংশধর বাবা পুরষোত্তমলাল বেদীর সঙ্গে আমরা এক বাড়ীতে অতিথি হয়েছি। তাঁর পত্নী ফ্রীডা ইংরেজ কন্যা। পরে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হন। পুত্র কবীর এখন নামকরা ফিল্মস্টার। বেদী দাঁড়ি গোঁফ কেশ পাগড়ীর ধার ধারতেন না। অথচ সাচ্চা শিখ। এই উদারতা আজকাল কমে আসছে। অকালীরা কট্টর শিখ। তাঁদের বক্তব্য হলো হিন্দু সাকারবাদ ও অবতারবাদের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট করার জন্যেই তাঁদের ধর্মের উদ্ভব। ইউরোপে যেমন প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মের। তাঁরাও যদি সনাতনী হয়ে যান তো তাঁদের পার্থক্য রইল কোথায়? আজকের ভারতে মুসলমানরা তাঁদের দাবিয়ে রাখছে না। রাখছেন সনাতনী হিন্দুরা। রাজত্বটাকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে চালালে কী হবে? এটা হিন্দু রাজত্ব। হিন্দুর ভোটের উপর নির্ভর না করে বিধানসভায় বা লোকসভায় নির্বাচিত হওয়া অসম্ভব। মন্ত্রিত্ব পাওয়া অসম্ভব। বড়ো বড়ো পদও হিন্দুদের দয়া না হলে পাবার উপায় নেই। এর জন্যে হিন্দুরা কি মাশুল আদায় না করে ছাড়বে? মাশুল জোগাতে গেলে শিখদের আইনডেনটিটি থাকবে না।

হিন্দুদের চেয়ে আর্যসমাজীদের সঙ্গেই শিখদের মিল বেশী, অমিল কম। অথচ আর্যসমাজীদের সঙ্গেও ঝগড়া। ওঁরাও নিরাকারবাদী, দেবদেবী পূজা করেন না, অবতার মানেন না, ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্বীকার করেন না। কিন্তু ওঁরা শিখদের মতো

গুরুবাদী নন। ওঁদের কাছে বেদই প্রথম কথা ও শেষ কথা। গ্রন্থসাহেব সমান মর্যাদা পান না। তারা চায় সংস্কৃত, হিন্দী ও দেবনাগরী। শিখরা চায় পাঞ্জাবী ও গুরুমুখী। সংস্কৃত নয়। ভাষা ও লিপির প্রশ্নে অকালীরা সমান কট্টর। ধর্মে পরমত সহিষ্ণুতা সম্ভবপর, ভাষায় বা লিপিতে নয়। দ্বিভাষী ভারতীয় পাঞ্জাবকে দ্বিখণ্ড করে তারা একভাষী করেছেন। সরকারী ভাষা এখন হিন্দী ও পাঞ্জাবী নয়, একমাত্র পাঞ্জাবী। দুই লিপির বদলে এখন একমাত্র গুরুমুখী লিপিই সরকারী লিপি। এখন তাঁদের পথের কাঁটা হয়েছে চণ্ডীগড়। সেটা পাঞ্জাব ও হরিয়ানার যুক্ত রাজধানী। সেখান থেকে হরিয়ানার হিন্দীওয়ালাদের সরাতে হলে তার বদলে ফাজিলকা তালুক ছাড়তে হয়। সেটা হিন্দীভাষী এলাকা। কিন্তু সেখানে তুলার চাষ হয়। তাই সমৃদ্ধ এলাকা। সেটা হাতছাড়া করলে সমৃদ্ধিতে টান পড়ে। শিখরা তার বেলা নাছোড়বান্দা।

এমনি আরো কয়েকটা প্রশ্নে সনাতনীদের তথা আর্যসমাজীদের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে অকালীদের মধ্যে যারা চরমপন্থী তারা ভারত থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে মাস্টার তারা সিংয়ের মতো খালিস্তান বলে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র চায়। তার জন্যে খালিস্তানবিরোধীদের রক্তপাত করতেও বিমুখ নয়। নরমপন্থীরা ততদূর যেতে ইচ্ছুক নয়। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কয়েকটা বিষয় রাখতে দিয়ে আর সব বিষয় রাজ্য সরকারের আয়ত্তে আনতে পেলেই সন্তুষ্ট হয়। ঝগড়াটা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারও নাছোড়বান্দা।

এর পেছনে আরো একটি রহস্য আছে। সেটা আছে বলেই শিখরা পাকিস্তানের সহানুভূতি ও প্রশ্রয় পাচ্ছে। শিখ হাইজ্যাকারদের প্রাণদণ্ড বা কারাদণ্ড এখনো হয়নি। হবেও না। হলে নামমাত্র দণ্ডের পর খালাস দেওয়া হবে। তবে সেটা নির্ভর করছে অকালীদের বন্ধুভাবের উপরে। পাকিস্তানের প্রতি বন্ধুভাব, ভারতের মুসলিমদের প্রতি বন্ধুভাব।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধবার পর ১৯৪০ সালে পাঞ্জাবীদের সকলের মনে এই ধারণা জন্মায় যে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানের আর দেরি নেই। "এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।" শিখরা আবার রণজিৎ সিংয়ের শিখ রাজত্ব ফিরে পাবে। মুসলমানরা আবার ফিরে পাবে মোগল রাজত্ব। আর হিন্দুরা ফিরে পাবে আবার তার আগের হিন্দু রাজত্ব। কিন্তু বিনা অস্ত্রে এসব হাসিল হবে কী করে? ইউনিয়নিস্ট মন্ত্রীদের লোকজন ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে রিক্রুট সংগ্রহের সময় দেখতে পান কেউ ঘর ছেড়ে বাইরে

যেতে চায় না। তাদের লড়াইটা তো বিদেশে জার্মানদের সঙ্গে নয়। নিজের প্রদেশে পরস্পরের সঙ্গে। তখন একটা ফন্দী আঁটা হয়। শিখদের সামনে গাজর ঝুলিয়ে মন্ত্রণা দেওয়া হয়, "শুনছি মুসলমানরা যুদ্ধে নাম লেখাচ্ছে, অস্ত্র পাবে, ফিরে এসে সেই অস্ত্র দিয়ে মসনদ দখল করবে।" মুসলমানদের সামনে গাজর ঝুলিয়ে মন্ত্রণা দেওয়া হয়, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? শিখরা যে যুদ্ধে যোগ দিতে চলল। সশস্ত্র হয়ে ফিরে আসবে। তখন মসনদ দখল করবে।" হিন্দুদের সামনে গাজর ঝুলিয়ে মন্ত্রণা দেওয়া হয়, "শিখ আর মুসলমান রণসাজে সাজছে, রণশেষে ফিরে এসে সিংহাসন অধিকার করবে। তোমরা হবে আবার পরাধীন।"

গাজরের কী মহিমা! তিন পক্ষই অস্ত্র হাতে ইংরেজদের নেতৃত্বে লড়তে বেরোয়। শিখ হাঁকে, "সৎ শ্রীঅকাল।" মুসলমান হুঙ্কার ছাড়ে, "আল্লা হো আকবর।" আর হিন্দু চিৎকার করে, "দুর্গামাঈ কী জয়।" গাজর আপাতত শিকেয় তোলা থাকে। যুদ্ধে জিতে ফিরে আসে তিন পক্ষই। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে একা একা লড়তে সাহস হয় না কারো। আর ইংরেজও যে বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী দেবে তাও সম্ভবপর নয়। ইংরেজ থাকতে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করা যায় না। শেষে দেখা গেল ইংরেজরা সত্যি সত্যি তল্পি তল্পা গোটাতে যাচ্ছে। ক্যাবিনেট মিশন স্কীম মেনে নিলে অখণ্ড ভারত। নয়তো পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান। তা দেখে তারা সিংয়ের অনুগামী শিখদের তরফ থেকে রব ওঠে, "শিখদের জন্যে চাই খালিস্থান।" মাউন্টব্যাটেন বলেন, "অতি ন্যায্য দাবী। শিখদের জন্যেও আমার কিছু করা উচিত। কিন্তু পাঞ্জাবে তো এমন একটিও জেলা নেই যেখানে শিখরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কোথাও মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, কোথাও হিন্দুরা। ওরা কেন ওদের বখরা থেকে শিখদের এক ভাগ ছেড়ে দেবে?" হিন্দু বা মুসলমান কেউ বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ মেদিনী দেবে না। মাউন্টব্যাটেন নাচার। তখন শিখদের সামনে দুটিমাত্র বিকল্প। বেছে নিতে হবে দুটির একটি। পাকিস্তান বা হিন্দুস্থান। ওরা সেই সন্ধিক্ষণে বেছে নেয় হিন্দুস্থান। যার নাম পরে হয় ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন বা ইণ্ডিয়া। শিখদের বড়ো আশা ছিল লাহোর ও নানকানা সাহেব পড়বে পূর্ব পাঞ্জাবের ভাগে। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে সে দুটি পড়ে পশ্চিম পাঞ্জাবের ভাগে। তার আগে থেকে শুরু হয়ে আছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা ও সদলবলে মহাপ্রস্থান। সেটা চরমে ওঠে যখন রোয়েদাদ প্রকাশ করা হয়। মহাপ্রস্থানপর্ব পরিণত হয় মুষল-পর্বে। পাঁচ লাখ মানুষ পাঁচ ছয় সপ্তাহের মধ্যে কচুকাটা হয়। নব্বই লাখ করে এপার

ওপার। ইতিহাসে তার নজীর নেই। না ভারতের ইতিহাসে, না জগতের ইতিহাসে। একদা যারা অন্নের আশায় যুদ্ধযাত্রা করেছিল তারাও জীবিত ফিরে এসে পদযাত্রা করে কিংবা পরলোক যাত্রা। মহাযুদ্ধেও ভারতে এত লোক মরেনি।

শিখরা সবাই মিলে পূর্ব পাঞ্জাবে চলে আসার ফলে ও মুসলমানরা সবাই মিলে পশ্চিম পাঞ্জাবে চলে যাওয়ার ফলে পূর্ব পাঞ্জাবের কয়েকটি জেলায় শিখরাই হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। এই যে পরিবর্তনটা চোখের সামনে ঘটে যায় এটার মর্ম উপলব্ধি করতে বেশ কিছুকাল কেটে যায়। হিন্দুদের সঙ্গে মোটামুটি সমতা থাকায় হিন্দী ও পাঞ্জাবী উভয় ভাষাই হয় সরকারী ভাষা। তাতে দু'পক্ষই সন্তুষ্ট। কিন্তু পুনর্বিন্যাসের ফলে ভারতের আসাম ভিন্ন আর সব রাজ্য একভাষী হয়। তখন আসাম থেকে দাবী ওঠে, একভাষী রাজ্য চাই। অসমীয়া হবে একমাত্র সরকারী ভাষা। তার জন্যে আসামেরও চাই পুনর্বিন্যাস। তেমনি পাঞ্জাবেও আওয়াজ ওঠে, একভাষী রাজ্য চাই। পাঞ্জাবী হবে একমাত্র সরকারী ভাষা। তার জন্যে পাঞ্জাবেরও চাই পুনর্বিন্যাস। মারদাঙ্গা না বাধলে এদেশে কিছু হবার জো নেই। আসামেরও পুনর্বিন্যাস হয়। পাঞ্জাবেরও।

তখন মুশকিল বাধে রাজধানী নিয়ে। ন্যায়বিচারে সেটা হরিয়ানারাই প্রাপ্য। কিন্তু শিখরাও নাছোড়বান্দা। লাহোরের পরিবর্তে চণ্ডীগড় পেয়ে সেখানে তারা জাঁকিয়ে বসেছে। অন্য উপায় না দেখে ভারতের প্রধান মন্ত্রী চণ্ডীগড়কে করেন ইউনিয়ন টেরিটরি। সেখানে দুই সরকারের দুই গভর্নর বাস করেন। হাইকোর্ট কিন্তু একটাই। চণ্ডীগড় হিন্দী ও পাঞ্জাবী উভয় ভাষাই রাখে। প্রধানমন্ত্রী একথাও বলেন যে পাঞ্জাবীভাষী রাজ্য যদি স্বতন্ত্রভাবে চণ্ডীগড চায় তবে তাকে হরিয়ানাকে ক্ষতিপুরণ হিসাবে ফাজিলকা তালুক দিতে হবে। যেহেতু সেখানে হিন্দীভাষীদের সংখ্যাধিক্য। তখন থেকে চণ্ডীগড় ও ফাজিলকা নিয়ে ঠাণ্ডা লড়াই চলছে। প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করতে চান না। তাই রাগটা পড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। বিনা শর্তে চণ্ডীগড় পাঞ্জাবীভাষী রাজ্যকে দিতে হবে।

এই রাজ্য যখন সৃষ্টি করা হয়েছিল তখন ভাষার ভিত্তিতেই হয়েছিল, ধর্মের ভিত্তিতে হয়নি। এখন রাজ্য হাতে পাবার পর দাবীর ভিত্তি বদলে গেছে। এটা হবে ধর্মভিত্তিক শিখ রাজ্য। যেহেতু মুসলমানদের দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তান ও হিন্দুদের হিন্দুস্থান সেহেতু আজ এতকাল পরে শিখদের দিতে হবে খালিস্থান। তা

যদি সম্ভব না হয় তো শিখ ধর্মভিত্তিক পাঞ্জাব। তাকে দিতে হবে একটা স্পেশাল স্টেটাস। সে রাজ্যের সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে তিন চারটি বিষয় ছাড়া আর সব কেন্দ্রীয় বিষয়। ভারত সরকার যদি এতে রাজী হন তবে সংবিধান বদলাতে হবে ও তার সুযোগ নেবে অন্যান্য রাজ্য। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার হবে ঠুঁটো জগন্নাথ। পার্লামেন্ট কখনো সংবিধান সংশোধন করে নিজেকেও ঠুঁটো বলরাম বানাতে রাজী হবে না। প্রধানমন্ত্রীও ঠুঁটো সুভদ্রা হতে নারাজ হবেন।

অকালীরা এখন ধর্মের নামে 'ধর্মযুদ্ধ' শুরু করে দিয়েছে। আট হাজার প্রাক্তন সৈনিক তাদের দাবী সমর্থন করেছে। তাদের হাতে বন্দুক রয়েছে। যে দাবীটা মাউন্টব্যাটেন না-মঞ্জুর করতে বাধ্য হলেন ১৯৪৭ সালে সেটা পাকে প্রকারে আদায় হবে স্বাধীন ভারতের কাছ থেকে, তাকে আরো খণ্ডিত হবার পথ খোলা রেখে। চরমপন্থীরা খালিস্তান না নিয়ে ছাড়বে না, নরমপন্থীরা আপাতত তার চেয়ে কম নিয়ে আরো বেশীর জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। পাকিস্তানের অঙ্গহানি ঘটবে না, ঘটবে ভারতেরই, যদিও এটা হিন্দু রাষ্ট্র নয়, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এর সর্ব স্তরে শিখদের অনুপাতের অধিক উপস্থিতি। তবে এটাও ঠিক যে ব্রিটিশ আমলে মার্শাল রেস হিসাবে তারা যে মাত্রাতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা পেয়েছিল সেটা অন্যান্যদের দাবীর চাপে ক্রমে খর্ব হয়েছে। এটা শিখদের অসহ্য। সৈনিকবৃত্তি থেকে তাদের একটা বাঁধা আয় ছিল। মিলিটারি খরচার এক বিপুল অংশ তাদের গ্রামে ব্যয়িত হতো। তবে আজকাল চাষ থেকে যে সমৃদ্ধি এসেছে সেটার বিপুল অংশ তো তারা ঘরে বসেই পাচ্ছে। চাষের কাজ আরো লাভজনক হওয়ায় অনেকে সৈন্যদলে ভর্তি হতে অনিচ্ছুক। নানা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে ওরা গাড়ী চালিয়ে প্রচুর অর্থ পায়। হোটেল চালিয়ে ওরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে যা পায় তার পরিমাণও প্রভূত। আমাদের এ পাড়াতেও এক পাঞ্জাবী হোটেল আছে।

বছর কয়েক আগে একজন পাঞ্জাবী অফিসার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তিনি বিভিন্ন ভাষার কবিতা কবিদের নিজেদের হাতে লিখিয়ে নিচ্ছেন। আমাকেও বলেন স্বহস্তে লিখে দিতে। আমি দুটি পুরোনো কবিতা নিজের হাতে নকল করে দিই। একটি বাংলা, অন্যটি ওড়িয়া। তিনি খুশি হয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে বসতে বলি। একটু সুখদুঃখের গল্প হোক। পার্টিশনে শিখদের মতো ক্ষতি আর কারো হয়নি। তাঁরা হারিয়েছেন তাঁদের ভূতপূর্ব রাজধানী লাহোর, যা আমাদের কলকাতা হারানোর সমতুল্য। তাঁরা হারিয়েছেন তাঁদের

পুণ্যতীর্থ নানকানা সাহেব, যা আমাদের পুণ্যতীর্থ নবদ্বীপের সমমূল্য। সেগুলি হয়েছে পাকিস্তানের সামিল। ভারতে যোগ দিয়েও তাঁরা হারিয়েছেন পাতিয়ালা প্রমুখ দেশীয় রাজ্য। আর তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট সেপারেট ইলেকটোরেট, ওয়েটেজ, চাকরিতে সেপারেট কোটা, ওয়েটেজ। তাঁর নিজের জন্মস্থান পশ্চিম পাঞ্জাবে। তাঁর কি সেখানে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না, সে স্থান ফিরে পেতে ইচ্ছে করে না?

তিনি আনন্দের সঙ্গে উত্তর দেন, "পরিবর্তে আমরা যা পেয়েছি তাতে আমাদের সব ক্ষতি পুষিয়ে গেছে। জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগে আমাদের বাড়বাড়ন্ত। এতদিনে আমরা একটি রাজ্যে মেজরিটি হয়েছি। মাইনরিটি হওয়া বড়ো দুঃখের। কোন্ দুঃখে আমরা পেছন ফিরে তাকাব? ওসব চুকেবুকে গেছে ১৯৪৭ সালে। যা ঘটেছে তা বরাবরের মতো একবারেই ঘটেছে। আর আমরা লড়তে চাইনে। তবে আমাদের উপর লড়াই চাপিয়ে দিলে আবার লড়ব।"

আমি তাঁর মুখ দেখে অনুমান করি তিনি অন্তরে অসুখী। একটু অন্তরঙ্গভাবে বলি, "তবু আপনাদের মনের বাসনাটা কী? নানকানা সাহেবের মায়া কাটাতে পারবেন?"

তাঁর চোখ ছলছল করে। করুণ স্বরে বলেন, "শিখদের নিত্য প্রার্থনার সঙ্গে আমরা একটা বাক্য জুড়ে দিই। আবার যেন নানকানা সাহেবে ফিরে যেতে পারি।"

শিখদের নিত্য প্রার্থনার মতো ইহুদীদেরও একটা নিত্য প্রার্থনা আছে। তার সঙ্গে তাঁরাও জুড়ে দিতেন, "আবার যেন জেরুজালেমে ফিরে যেতে পারি।"

আমি বলি, "দু'হাজার বছর পরে ইহুদীরা জেরুজালেম আবার ফিরে পেয়েছে। তেমনি একদিন আপনারাও নানকানা সাহেব ফিরে পেতে পারেন।" তিনি হেসে ওঠেন। তারপর বিদায় নেন।

প্রার্থনার শেষ বাক্য পূরণের জন্যে অকালী শিখরা ততকাল সবুর করবে না। ইহুদীদের মতো ওরাও একটা নেশন। আমার মনে হচ্ছে চরমপন্থীরা পাকিস্তানের সঙ্গে একটা স্বতন্ত্র সন্ধি চায়। তার জন্যে দরকার খালিস্থান বলে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। তার জন্যে চাই অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন বৃহত্তর পাঞ্জাব রাজ্য। তার জন্যে চাই বিনা শর্তে চণ্ডীগড়।

তবে স্বতন্ত্র সন্ধির প্রয়োজন হবে না, যদি পকিস্তানের সঙ্গে ভারতের মিটমাট হয়ে যায়। কাশ্মীর নিয়ে একটা ফয়সালা হলে পাকিস্তানও তাতে রাজী। সেটা কবে হবে, কোন্ কোন্ শর্তে হবে তা কে বলতে পারে? তবে মিটমাটের দিকে দুই

পক্ষই এক পা এক পা করে এগোচ্ছে। চলি চলি পা পা। সেটা যদি সময় থাকতে ঘটে তবে শিখদের সঙ্গে হিন্দুদের সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভবপর। হ্যাঁ, সংঘর্ষটা আসলে হিন্দুদের সঙ্গেই। অকালীদের অভিযোগ এই যে হিন্দুরা পাঞ্জাবীভাষী হয়েও মাতৃভাষা ছেড়ে হিন্দী বরণ করছে ও সেই সূত্রে হরিয়ানা কেড়ে নিয়েছে। সিমলা কেড়ে নিয়েছে। ফাজিলকা কেড়ে নিতে চায়। সেপারেট ইলেকটোরেট উঠে যাবার পর থেকে শিখরা নির্বাচনের দ্বন্দ্বে হিন্দু ভোট নির্ভর। হিন্দুরা শিখ ভোট নির্ভর নয়। হিন্দু ভোটে নির্বাচিত কংগ্রেস সরকার রাজ্যেই হোক আর কেন্দ্রেই হোক শিখদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করছে। শিখরা তাদের ন্যায্য ভাগ পাচ্ছে না।

পাঞ্জাবীরা এক আশ্চর্য জনগোষ্ঠী। একই গ্রামের শিখরাও জাঠ, মুসলমানরাও জাঠ, হিন্দুরাও জাঠ। অথচ এরা যদি পড়ে হিন্দী, ওরা পড়ে উর্দু, আর তারা পড়ে পাঞ্জাবী। এরা যদি লেখে দেবনাগরী লিপিতে ওরা লেখে ফারসী লিপিতে, আর তারা লেখে গুরুমুখী লিপিতে। বাংলাদেশের সমস্যা অপেক্ষাকৃত সরল। এখানে ধর্মভেদ আছে, ভাষাভেদ নেই, লিপিভেদ নেই। ভাষা বা লিপি নিয়ে কোনো পক্ষই উত্তেজিত নয়। ধর্মভেদ না থাকলে সব বাঙালী এক হতে পারত, কিন্তু সব পাঞ্জাবী এক হবে না। বিভিন্ন ভাষায় পড়াশুনা করে ও বিভিন্ন ভাষায় বইপত্র লিখে বিভিন্ন মানসিকতার অধিকারী হবে। ষাট বছর আগে এমনটি ছিল না। লালা লাজপৎ রায়ের সম্পাদিত 'বন্দে মাতরম্' আনিয়ে দেখি সে পত্রিকার ভাষা উর্দু, লিপি ফারসী। অথচ লালাজী ছিলেন ধর্মে আর্যসমাজী। আর্যসমাজীরা দলকে দল হিন্দীনবীশ হয়ে মুসলমানদের কাছ থেকে সরে গেছে। উর্দুভাষী হিন্দুদের কাছ থেকেও। হ্যাঁ, হিন্দুদেরও বহুসংখ্যক পরিবার এখনো উর্দু পত্রিকা পড়ে, উর্দুতে লিখে ছাপায়। উর্দু সাহিত্যের জন্যে পুরস্কার এবার একজন হিন্দুকে দেওয়া হয়েছে। ফিরাক গোরখপুরী তো জ্ঞানপীঠ পুরস্কারও পান। তাঁর আসল নাম রঘুপতিসহায়। গোরখপুরে বাড়ী। সেই থেকে গোরখপুরী। আর ফিরাক তাঁর ছদ্মনাম। উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন রামবাবু সক্সেনা। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। উর্দুভাষী হিন্দু। উত্তরপ্রদেশের কায়স্থদের প্রথা তাঁদের ছেলেদের নাম রাখা হতো ফারসীতে। তারা লেখাপড়া করত উর্দুতে। ইকবাল বখ্‌ত হিন্দু। তাঁর পিতার নাম খুশবখ্‌ত রায়। রায় না লিখলে কার সাধ্য চেনে হিন্দু কি মুসলমান?

ধর্মের মতো ভাষাও মানুষকে বিভক্ত করে। নইলে অসমীয়া হিন্দুর সঙ্গে বাঙালী হিন্দুর এমন কী তফাৎ ! আসাম অন্দোলন আসলে বাঙালীবিরোধী আন্দোলন। ধর্মও মানুষকে এক করতে পারছে না। এসব দেখে শুনেও যারা হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখছেন তাঁরা কি শিখদেরও শিখরাষ্ট্র গঠন করতে প্ররোচনা দিচ্ছেন না? হিন্দীভাষীরা মুখে বলছেন বটে, শিখরাও হিন্দু। কিন্তু তাই যদি হয় তবে হিন্দুরাই বা হরিয়ানার জন্যে ফাজিলকা চায় কেন? বিনা শর্তে চণ্ডীগড় ছেড়ে দেয় না কেন? শিখরাই বা ধর্মযুদ্ধে নামতে যায় কেন? এ যুদ্ধ তো বিপথগামী হয়ে হিন্দু শিখের রক্তপাতে পর্যবসিত হবে। তখন মিটমাট আরো দুরূহ হবে।

এতদিন আমরা জানতুম যে ইণ্ডিয়ানরা একটি নেশন। এখন শুনছি শিখরাও একটি নেশন। শিখরা একটি নেশন হলে মুসলমানরাই বা নয় কেন? খ্রীস্টানরা কী অপরাধ করল? আর হিন্দুরাই বা পেছিয়ে থাকবে কেন? দেশটা কি তা হলে চার পাঁচ ভাগ হয়ে যাবে? প্রত্যেকটি ভাগেই প্রত্যেকটি তথাকথিত নেশন থাকবে ও পরস্পরকে ফরেনার বলে ভাগিয়ে দিতে চাইবে? আসাম মার্কা আন্দোলন ভারত-ব্যাপী হবে? দেশরক্ষা করবে কে? দেশ কি আরো একবার পরাধীন হবে? তা হলে এত দীর্ঘকাল ধরে সারা দেশব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রাম চালানো হলো কেন? শিখদের দানও তো কম নয়।

ন্যাশনালিজম একটি ঈর্ষাপরায়ণা দেবী। ইনি চান অসপত্ন হতে। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম ইণ্ডিয়ার পূজাবেদীতে অন্য কোনো দেবীর সপত্নী হতে রাজী হবেন না। দুই নেশনের অস্তিত্ব মেনে নিয়ে মিটমাট করা অসম্ভব। শিখদের প্রথম আনুগত্য ভারতের প্রতি। নয়তো ভারত ছাড়তে হবে। খানিকটে জায়গা কেটে নিয়ে খালিস্তান প্রতিষ্ঠা যদি করতেই হয় তো তার জন্যে তরবারি ধারণ করতে হবে। যুদ্ধে জিততে হবে। নির্বাচনে তার মীমাংসা হবে না। যারা ভারতের প্রতি অনুগত নয় তাদের নির্বাচনেই যোগ দেওয়া উচিত নয়। আগে নাগরিকের দায়িত্ব পালন করতে হবে, তার পরে নাগরিকের অধিকার দাবী করতে হবে।

"রাজ করেগা খালসা" দেড় শতাব্দী পরে আবার এই ধ্বনি উঠেছে। এবার মোগলকে বা ইংরেজকে বা পাকিস্তানকে হটিয়ে নয়, হিন্দুকে হটিয়ে। পাঞ্জাবে এখন হিন্দুদের সংখ্যানুপাত শতকরা আটচল্লিশ। অকালীদের দাবী অনুসারে হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ ও রাজস্থানের কতক অংশ পাঞ্জাবের সঙ্গে জুড়লে ও গোটা চণ্ডীগড় তাকে ছেড়ে দিলে হিন্দুর সংখ্যানুপাত শতকরা পঞ্চাশ তো ছাড়িয়ে যাবেই, বাহান্নও

ছাড়িয়ে যেতে পারে। তা হলে নির্বাচনে কারা জিতবে? শিখরা না হিন্দুরা? এটা আঁচ করতে পেরে কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন যে অ-পাঞ্জাবী হিন্দু কর্মী ও শ্রমিকদের ভোট দিতে দেওয়া হবে না। কেন, ওরা কি ভারতীয় নাগরিক নয়? সরকারকে কর জোগায় না? গণতন্ত্র তা হলে কোথায় রইল? ন্যাশনালিজমও যাবে, ডেমোক্রাসীও যাবে। বাকী থাকবে কী?

দেশরক্ষায় শিখদের একটা মস্ত বড়ো ভূমিকা আছে। সবাই সেটা স্বীকার করে ও তার জন্যে তাদের শ্রদ্ধা করে। কিন্তু পাঞ্জাবী হিন্দুদেরও কি ভূমিকা নেই? ইণ্ডিয়ান আর্মির উপরে এর বিষম প্রতিক্রিয়া হবে। গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করার পথ খোলা রয়েছে। অকালীরা যে ক্ষমতার ভাগ পায়নি তা নয়। কিন্তু বহু শিখ কংগ্রেসেরও সভ্য। অনেকে কমিউনিস্ট পার্টিরও সভ্য। তারাও ক্ষমতার মুখ দেখেছে বা দেখতে চায়। কিন্তু পার্টির সভ্য হিসাবে। সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে নয়। রাজনীতিক্ষেত্রে ধর্মকে নিয়ে এলে আরো একটা মূলনীতিতে বাধে। সেটার নাম ধর্মনিরপেক্ষতা। যে রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ সে রাষ্ট্রে সম্প্রদায় অনুসারে ভোট দেওয়া নেওয়া হয় না। হিন্দুও মুসলমানকে ভোট দিতে পারে, মুসলমানও হিন্দুকে, উভয়েই শিখকে, শিখও উভয়কে। নয়তো ন্যাশানালিজমও যাবে, ডেমোক্রাসীও যাবে, সেকুলারিজমও যাবে। তা হলে তো আমাদের সংবিধানটাই হয় ব্যর্থ। কে এতে রাজী হবে? অকালীদের মধ্যে যাঁরা দূরদর্শী তাঁরা হয়তো সব দিক বিবেচনা করে 'ধর্মযুদ্ধ' থেকে নিবৃত্ত হবেন।

আফগান প্রসঙ্গ

এখন যার নাম আফগানিস্থান একদা সে দেশ ছিল ভারতবর্ষেরই অঙ্গ। যেমন পাকিস্তান। স্বতন্ত্র একটি দেশ হলেও সে ভারতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। দেশ-ভাগের পর পাকিস্তানের সঙ্গে। তার আমদানী রফতানীর বন্দর করাচী। তার সামুদ্রিক বাণিজ্যের অপর কোনো রাস্তা নেই। সেদিক থেকে সে ব্রিটিশ আমল থেকেই ভারতনির্ভর ও পরে পাকিস্তাননির্ভর। এ রাস্তা যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে তাকে বাধ্য হয়ে মধ্য এশিয়ার ভিতর দিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে আমদানী রফতানীর ব্যবস্থা করতে হয়। কিংবা ইরানের ভিতর দিয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে।

আফগানিস্থানের অবস্থান সুইটজারল্যাণ্ডের মতো। চারদিকেই অন্যান্য দেশ। কোনোদিকেই সমুদ্রপথ নেই। এর দরুন সুইটজারল্যাণ্ড কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? না, সে তার অবস্থানকে মেনে নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে। সকলের সঙ্গেই তার সদ্‌ভাব। সকলের সঙ্গেই তার শান্তির সম্পর্ক। তার মূলনীতি রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা। সে কোনো শিবিরেই কখনো যোগ দেয় না। তবে আত্মরক্ষার জন্যে সব সময় প্রস্তুত থাকে। কেউ যদি সুইটজারল্যাণ্ড আক্রমণ করে তবে প্রবল বাধা পাবে। জনসংখ্যার অধিকাংশই জার্মানভাষী। অথচ ভাষার নাম করে বা জাতির নাম করে হিটলার তাদের জার্মান শিবিরে টানতে পারেননি। তাই জার্মানরা হেরে গেলেও জার্মানভাষী সুইসরা হেরে যায়নি। তারা অপরাজিত ও যতদিন নিরপেক্ষ থাকবে ততদিন অপরাজেয়।

এতদিন অমরা জানতুম যে আফগানিস্থানই এশিয়ার সুইটজারল্যাণ্ড। সেইরকম নিরপেক্ষ ও সেইরকম শান্তিপূর্ণ। কেউ তাদের ঘাঁটাবে না। তারাও কাউকে ঘাঁটাবে না। ভারতের ইংরেজ শাসকরা তাদের বার বার ঘাঁটিয়ে শেষপর্যন্ত এই শিক্ষা লাভ করেছিলেন যে তাদের গায়ে হাত না দিলেই তারা ইংরেজের বন্ধু থাকবে, রুশের দিকে ঝুঁকবে না। তবে বরাবরই আশঙ্কা ছিল যে আফগানরা রাশিয়ার দিকে না ঝুঁকলেও রাশিয়া আফগানদের দিকে ঝুঁকতে পারে। মধ্য এশিয়ার আর পাঁচটা

মুসলিম রাজ্য যেমন করে গ্রাস করেছে আফগানিস্থানকেও তেমনি করে মুখে পুরতে পারে। সেইজন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও ব্রিটিশ বেলুচিস্থানে ব্রিটিশ আর্মি সদা সতর্ক ছিল। ইংরেজরা জানত যে আসল শত্রু আফগান রাষ্ট্র নয়, রুশ সাম্রাজ্য। পরে সোভিয়েট ইউনিয়ন। নানা আন্তর্জাতিক কারণে রাশিয়ার সঙ্গে ব্রিটেনের বিরোধ বেধে যেতে পারে। তখন সোভিয়েট সৈন্য আফগানিস্থানে প্রবেশ করতে উদ্যত হলে ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্য তার আগেই কোয়েটা থেকে কান্দাহারে হাজির হবে, কান্দাহার থেকে কাবুলে। যে আগে দখল করবে তারই তো জয়ের সম্ভাবনা বেশী।

আজ যদি ইংরেজ এদেশে থাকত তা হলে রুশ সৈন্য আফগানিস্থানে প্রবেশ করতে সাহস পেত না। আফগান বিপ্লবীরা একাই প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে মোকাবিলা করত। রুশ সাহায্য চাইতও না, চাইলে পেতোও না, পেলে যা হতো তার নাম আন্তর্জাতিক যুদ্ধ। আর পাঁচটা দেশও তাতে জড়িয়ে পড়ত। ইংরেজরা নেই। তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব যাদের হাতে অর্পণ করে গেছে তারা সারা ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান নয়, তারা পাকিস্তানী মুসলিম। হিন্দুকে তারা ভাগিয়ে দিয়েছে। তাদের সৈন্যদলে একটিও হিন্দু আছে কি না সন্দেহ। নইলে হিন্দু মুসলমান শিখ মিলে ছুটে যেত রুশ সৈন্যদের পথ রোধ করতে। যাতে আফগানিস্থান তার নিরপেক্ষতা না হারায়। যাতে রাশিয়া সেখানে ঘাঁটি গাড়তে না পারে। এখন ভারতের হিন্দু শিখের মাথাব্যথা নেই। যত মাথাব্যথা পাকিস্তানের মুসলমান কর্তৃপক্ষের। তাদের এখন দোস্ত যদি থাকে তো তারা আরব, ইরানী, তুর্ক, ইংরেজ, মার্কিন, চীন। ভারতরাষ্ট্র তাদের দোস্ত নয়, তাদের চোখে দুশমন। হিন্দু শিখ সৈন্য যদি পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে আফগানিস্থানে যায় তবে স্বাগত হবে না। বাধা পাবে।

ব্যাপার দেখে মনে হয় পাকিস্তান নিজেও রাশিয়ার সম্মুখীন হবে না, ভারতকেও হতে দেবে না। তা হলে ভারতেরই বা এমন কী গরজ? কেনই বা সে রাশিয়াকে তার শত্রু করতে যাবে? কবে একদিন রাশিয়া পাকিস্তানে প্রবেশ করে ভারতের দিকেও পা বাড়াবে এই আতঙ্কে কি ভারত এখন থেকেই দিশাহারা হয়ে আগে-ভাগে পা বাড়াবে? বাড়াতে চাইলে কোন্ পথ দিয়ে বাড়াবে? পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে তো নয়। পাকিস্তান সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাকিস্তান রক্ষার জন্যে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো যায় না। তেমনি, আফগান সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে

আফগানিস্থান রক্ষার জন্যেও সৈন্য পাঠানো যায় না। ভারতের বর্তমান সরকার প্রাক্তন ব্রিটিশ সরকারের মতো রাশিয়ার অগ্রগতি রোধ করার জন্যে নিজে অগ্রগামী হতে পারে না। অন্ধভাবে ব্রিটিশ পলিসি অনুসরণ করতে গেলে এমন বিপাকে পড়বে যে অগত্যা ইংলণ্ড আমেরিকার কাছে সাহায্য চেয়ে দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিতে হবে।

মনে রাখতে হবে যে আফগানিস্থানের নিকটতম প্রাচ্য প্রতিবেশী এখন ব্রিটিশ ভারত নয়, এখন পাকিস্তান। সে ইচ্ছা করলে করাচী বন্দর দিয়ে আমদানী রফতানী বন্ধ করে দিতে পারে। সেইভাবে বিপ্লবী আফগান সরকারের উপর চাপ দিতে পারে। পরোক্ষে রুশ আগন্তুকদের উপরেও। সে তা করেছে কি না জানিনে। যদি করে না থাকে তবে সে-স্বাধীনতা তার আছে। যদি করে থাকে তবে সেও জড়িয়ে পড়েছে। তাছাড়া এটাও তো শোনা যায় যে পাকিস্তানের সীমানা থেকে আফগান বিদ্রোহীরা আফগানিস্থানে হানা দিচ্ছে। এটাও একপ্রকার জড়িয়ে পড়া। পাকিস্থানের কি এত সামর্থ্য আছে যে সে মিত্রহীন ভাবে একাই জড়িয়ে পড়তে পারে? পেছনে মিত্র আছে নিশ্চয়। আজকাল ধর্মের জিগীর তুললে মিত্র পাওয়া কঠিন নয়। গোটা মধ্য প্রাচ্য জুড়ে ইসলামের পুনরুজ্জীবন চলেছে। এটা যদি মধ্য এশিয়ায় চারিয়ে যায় তবে সোভিয়েট ইউনিয়ন তার সংহতি রক্ষা করতে পারবে না। সোভিয়েট ইউনিয়ন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমবায়। সে ধর্মের নামে জেহাদ বরদাস্ত করবে না। আফগানিস্থানের সমস্যা তার কাছে এক জীবনমরণ সমস্যা। সেখানে কমিউনিজম যদি হেরে যায় তবে মধ্য এশিয়াতেও হেরে যাবে। অথচ সেখানে কমিউনিজমকে জিতিয়ে দেওয়া একমাত্র বৈদেশিক সাহায্যের দ্বারা হতে পারে না। বিপ্লবী সরকারকে বহাল রাখাও চাই।

ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতেরও জাতীয় নীতি। এটা ইসলামী রাষ্ট্র নয়। ইসলামের পুনর্জাগরণে এর কোনো ভূমিকা নেই। ভারতীয় মুসলমানদের কারো যদি জেহাদে মতি হয় তিনি পাকিস্থানে বা ইরানে গিয়ে পাশপোর্ট বদল করে আফগান বিদ্রোহী-দের দলে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু ভারতকে এর মধ্যে জড়াতে চাইবেন না। মুসলিম দেশের সংখ্যা এখন চল্লিশের উপর। তাদের ধনবল এখন ভারতের চেয়েও বেশী। একজোট হলে সৈন্যবলও কম নয়। তবে ভারতকে এর মধ্যে টানা কেন? সোভিয়েট ইউনিয়ন আমাদের বন্ধু। বন্ধুকে বড়ো জোর পরামর্শ দিতে পারি যে, আফগানিস্থান থেকে সরে যাও। কিন্তু জেহাদ ঘোষণা করলে বন্ধুতা বিসর্জন

দিতে হয়। এ খেলা বিশ্ব ইসলামীরাও খেলতে পারে কি না সন্দেহ। রাশিয়া একটি সুপারপাওয়ার। তার সঙ্গে লড়তে গেলে আরেকটি সুপারপাওয়ারকে সঙ্গে জড়াতে হয়। তার মানে আমেরিকাকে যুদ্ধে নামাতে হয়। সে যদি লড়তে রাজী হয় তো তার আগে ঘাঁটি দাবী করবে ও উড়ে এসে জুড়ে বসবে। বিশ্ব ইসলামীদের স্বাধীনতা কোথায় থাকবে? তাঁরাও সেটা বোঝেন। তাই আগুয়ান হচ্ছেন না।

একথা কি কেউ বলছেন যে আফগানিস্থানের বিপ্লবটা আফগানদের নিজেদের উদ্যোগে ঘটেনি, ঘটেছে সোভিয়েটের উদ্যোগে? যতদূর বুঝতে পারা যাচ্ছে উদ্যোগটা স্বদেশের বিপ্লবীদেরই। বিপ্লব ঘটলে প্রতিবিপ্লবও ঘটে। দেশের প্রতি-বিপ্লবীরা বিদেশের সাহায্যও পায়। সুযোগ পেলে বিদেশীরা সৈন্যও যে না পাঠায় তা নয়। কিন্তু ইরান তথা পাকিস্তান ঘর সামলাতেই ব্যস্ত। আর কেউ যখন সৈন্য পাঠাচ্ছে না তখন সেভিয়েটই বা সৈন্য পাঠাতে যায় কেন? কৈফিয়ৎটা এই যে আফগানিস্থানের বিপ্লবীরা সৈন্য পাঠাতে অনুরোধ করেছিল। যেখানে প্রতি-বিপ্লবীরা সৈন্য আমদানী করেনি সেখানে বিপ্লবীরা সৈন্য আমদানী করেছে, এর তাৎপর্য কী? বিপ্লবীরা প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পাবেনি। বাইরে থেকে সৈন্য আমদানী না করলে ক্ষমতার আসনে টিকতে পারত না। আমানুল্লার মতো বাচ্চা-ই সাকোর দ্বারা বিতাড়িত হতো।

আফগানিস্থানের দুর্ভাগ্য এই যে সেদেশে আমানুল্লাদের চেয়ে বাচ্চা-ই সাকোদের জোর বেশী। সেটা শস্ত্রের জোর নয়, শাস্ত্রের জোর। লড়াইটা যেন কোরানের সঙ্গে 'ডাস কাপিটল'-এর। জনগণ যদি কোরানের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের বশীভূত হয় তবে মোল্লারাই গণসমর্থন পাবে। যে পক্ষে গণসমর্থন সে পক্ষেই সাফল্য। তা হলে কি বিপ্লব ব্যর্থ হবে? বোধহয় না। আফগানিস্থান যদি ইথিয়োপীয়ার পথ নেয় তা হলে বিপ্লব সফল হতেও পারে। সেদেশের জনগণ বাইবেলের প্রতি অন্ধ-বিশ্বাসী। কিন্তু সেদেশের সম্রাট বিরাট এক সৈন্যদল গঠন করেছিলেন, যাতে চাষীর ছেলেদেরই প্রাধান্য। চাষীর ছেলেরা প্রমোশন পেতে পেতে যখন কর্নেল পর্যন্ত ওঠে তখন তাদের পদোন্নতির সীমায় এসে পৌঁছে যায়, কারণ উপরের দিকের জেনারলরা অভিজাতবংশীয়। তখনি তারা ক্ষমতা দখল করে। আফানিস্থানেও উপরের দিকে যাঁরা আছেন তাঁরা অভিজাত বা বুর্জোয়া বংশধর। নিচের দিকে যারা আছে তারা চাষীর ছেলে। বিপ্লবী সরকার চাষীর ছেলেদের ধরে নিয়ে এসে

সৈন্যদলে ভর্তি করেছেন ও তাদের সামনে তুলে ধরেছেন পদোন্নতির অভূতপূর্ব সুযোগ। এটা রাশিয়ান ফৌজের শিক্ষায়। রাশিয়ান ফৌজ সরে যাবার আগে চাষীর ছেলেদের তালিম দিয়ে তাদেরই হাতে বিপ্লব রক্ষার ভার সঁপে দিয়ে যাবে। 'ডাস কাপিটাল' ততদিনে তাদের মুখস্থ হয়ে থাকবে। নতুন শাস্ত্রই পুরাতন শাস্ত্রকে প্রতিহত করবে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ইণ্ডোনেশিয়ার কথা। চীনের পরে এশিয়ার বৃহত্তম কমিউনিস্ট পার্টি ছিল ইণ্ডোনেশিয়ায়। এক রাত বা দু'রাতের মধ্যেই সেই পার্টির পাঁচলক্ষ সদস্য ও সমর্থক ঘরে ঘরে কোতল হয়। যাদের হাতে কোতল হয় তারা ধর্মান্ধ ইসলামী বিপ্লববিরোধী দল। বিপ্লব ঘটাবার আগেই বিপ্লবীদের জান খতম। এখন আর ইণ্ডোনেশিয়ায় বিপ্লবের নাম গন্ধ নেই। অথচ জনগণের দুর্গতিরও অবধি নেই। ইণ্ডোনেশিয়ার অবস্থান এমন যে সেখানে রাশিয়া বা চীন সৈন্য পাঠাতে পারে না। নয়তো তারাও ইণ্ডোনেশিয়ায় ঢুকে প্রতিবিপ্লবীদের উপর শোধ তুলত। আফগানিস্থানের তিন দিকে ইসলামী রাষ্ট্র, সেসব রাষ্ট্র প্রতিবিপ্লবীদের মদত দিতে রাজী, যদি তাদেরও মদত দেবার জন্যে ইসলামী বা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্ররা রাজী থাকে। কেবল একটি দিক খোলা। সেদিকেও ইসলাম, কিন্তু সে ইসলাম সোভিয়েট ইউনিয়নভুক্ত ইসলাম। বলা যায় না তার সহানুভূতি কোন্ পক্ষে। বিপ্লবী পক্ষে না প্রতিবিপ্লবী পক্ষে। যদি বিপ্লবী পক্ষে হয়ে থাকে তবে আখেরে আফগান বিপ্লবীরাই জিতবে বা পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচবে। নয়তো সেভিয়েট সৈন্যকেই দশ বিশ বছর আফগানিস্থানে মোতায়েন থাকতে হবে, যেমন মোতায়েন রয়েছে চেকোস্লোভাকিয়ায়। যদি অসময়ে ঘরে ফিরে যায় তবে আফগান বিপ্লবীদের নেকড়ে বাঘের মুখে ফেলে রেখে যাবে। তখন ইণ্ডোনেশিয়ার পুনরাবৃত্তি হবে। কয়েকদিনের মধ্যেই কয়েক লক্ষ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বা সমর্থক খতম কিংবা উধাও। রুশ অভিমুখে।

যোধপুর পার্কের একটা বাড়ীতে কাবুলীরা ভাড়াটে ছিল। তেরো বছর আগে যখন এ পাড়ায় আসি তখন দেখি ওরা কাবুলী পোশাক পরে লাঠি হাতে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু পরে ওদের পোশাক বদলে যায়। ওরা ইউরোপীয় পোশাক পরে, পাগড়ী ছাড়ে, বাবরী ছাঁটে, লাঠি রাখে না। তখন কেউ চিনতে পারে না ওরা কাবুলী না পাঞ্জাবী। হিন্দু না মুসলমান। ওদের একজনের সঙ্গে আমার ভাব ছিল। দাউদ খান্ যখন ক্ষমতা অধিকার করেন কাবুলীটি অসুখী হয়। বলে, "দেখুন

দেখি কী অন্যায় ! ভগ্নীপতির এই কাজ !" যে মানুষ দাউদের সমর্থন করেনি সেই মানুষ যে কমিউনিস্টদের সমর্থন করবে তা মনে হয় না। কিন্তু আজকাল আর ওদের দেখতে পাইনে। মহাজনী ব্যবসা চলছে কি না সন্দেহ। নয়তো আফগানিস্থান সম্বন্ধে আরো ওয়াকিবহাল হওয়া যেত। সেখানকার বিপ্লবের সফলতা-বিফলতার উপরে ইরান, পাকিস্তান তথা ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

আধুনিক লঙ্কাকাণ্ড

অবিশ্বাস্য ব্যাপার! সিংহলীদের যারা দেখেছে তারা জানে ওদের মতো নিরীহ গোবেচারি জাতি ভারতের বা তার আশে পাশে নেই। সেই তারাই রাস্তায় ঘাটে তামিল দেখলেই তাকে নির্বিচারে হত্যা করেছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে। তা ছাড়া তাদের দোকান জ্বালিয়েছে, কারখানা জ্বালিয়েছে, বসতবাড়ী বা ফ্ল্যাট জ্বালিয়েছে। উপরন্তু তাদের সম্পত্তি লুটপাট করছে। পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে, আর্মি প্রশ্রয় দিয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্ররোচনা দিয়েছে। আর তামিল বলতে কেবল জাফনার তামিল নয়, চা-বাগানের বা রাবার বাগানের শ্রমিক তামিল, ভারতের নাগরিক তামিলও বোঝায়। যারা তামিল নয়, অথচ ভারতীয়, তাদের উপরেও হামলা করে। সরকার কারফিউ জারি করলেও কারফিউ মানে না। জানে যে সরকার তাদেরি ভোট নির্ভর।

রাষ্ট্রপতি জয়বর্ধন এক একদিন একরকম ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। প্রথমে গোটা তিনেক বামপন্থী পার্টিকে দোষ দিয়ে তাদের নেতাদের ধরপাকড় করেন। দলগুলোও নিষিদ্ধ হয়। তাদের পেছনে নাকি রাশিয়ার ও পূর্ব জার্মানীর হাত আছে। তার পরে সন্দেহ করেন যে কোনো এক দেশ সৈন্য পাঠিয়ে হস্তক্ষেপ করবে। সেরূপ অবস্থায় ইংরেজ, মার্কিন, পাকিস্থানী ও বাংলাদেশী সাহায্য পাওয়া যাবে কি না অনুসন্ধান করেন বলে শোনা যায়। তার পর তাঁর রোখ পড়ে জাফনা তামিলদের নেতাদের উপরে। দেশের সংবিধান এমনভাবে সংশোধন করা হয়েছে যে এর পরে তাঁরা আর পার্লামেন্টে আসতে পারবেন না, এলে বিচ্ছিন্নতাবাদ ত্যাগ করে আসতে হবে। শেষে স্বীকার করেছেন যে সিংহলী সৈনিকরাই জাফনার তামিলদের উপর নির্বিচারে গুলী চালিয়েছে, এ খবরটা তিনি আগে শোনেননি। এর প্রতিক্রিয়ায় তামিল সন্ত্রাসবাদীরা বোমা ফেলে তেরোজন সিংহলী সৈন্যকে কোতল করছে। তার প্রতিক্রিয়ায় দক্ষিণের সিংহলীরা তিনশো জনের উপর স্থায়ী তামিল, নয়া তামিল ও

ভারতীয় নাগরিক তামিল ও অ-তামিল খুন করেছে। আশি হাজারকে বাস্তুহারা করেছে। এটা হল সরকারী হিসাবে। বেসরকারী হিসাবে আরো অধিকসংখ্যক।

জয়বর্ধন আর্মির মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব তো দেখছেনই, কতক অংশের মধ্যে বিদ্রোহের বা বিপ্লবের গন্ধও পাচ্ছেন। ওরা নাকি কমিউনিস্টদের উস্‌কানিতে ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিল। ওদিকে তামিল সন্ত্রাসবাদী 'টাইগার' দলটিও নাকি কমিউনিস্টদের দ্বারা প্ররোচিত। চক্রান্ত! চক্রান্ত ছাড়া এমন কাণ্ড সম্ভব নয়! অথচ কলম্বোর খবরের কাগজে ভারতকেই গালাগাল দেওয়া হচ্ছে। দক্ষিণ ভারতের লোক নাকি শ্রীলঙ্কার তামিল সন্ত্রাসবাদীদের প্রেরণা দিচ্ছে ও আশ্রয় দিচ্ছে। পরোক্ষে ভারতের সরকারও নাকি দায়ী। ভারত সরকার বাংলাদেশের মতো সৈন্য পাঠিয়ে হস্তক্ষেপ করবে এ রকম একটা ধারণা উভয় পক্ষের মনে ছিল। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তা করেননি। করবেনও না। বিপন্নদের জন্যে তিনি খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ ইত্যাদি পাঠিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি জয়বর্ধনের সঙ্গে তিনি সদ্‌ভাব রক্ষা করেই চলেছেন। সন্ত্রাসবাদী তামিলদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই। বিচ্ছিন্নতাবাদ তিনি সমর্থন করেন না।

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে বহু সিংহলী যেমন আত্মহারা হয়ে তামিলদের হত্যা করেছে তেমনি বহু সিংহলী প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তামিলদের রক্ষা করেছেন। অপর পক্ষে তামিলরা সবাই কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী বা সন্ত্রাসবাদী নয়। অধিকাংশ মানুষ চাষী মজুর ও গরিব দুঃখী। ভাষা বা ধর্ম বা জাতি নির্বিশেষে। কিন্তু এটাও সমান সত্য যে মানুষ আজকাল ভাষাচেতন, ধর্মসচেতন, জাতিসচেতন সব দেশেই বা সব রাজ্যেই। যেমন আসামে, তেমনি পাঞ্জাবে, তেমনি অন্ধ্রপ্রদেশ, তেমনি শ্রীলঙ্কায়। ধর্মের ইস্যুতে তো ভারত ভাগ হয়েই গেল। তথা বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব। পরে ভাষার ইস্যুতে তো পাকিস্তানও ভাগ হয়ে গেল। পূর্ব পাকিস্তান হলো গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

শ্রীলঙ্কায় শুধু যে বৌদ্ধ আর হিন্দু এই দুই ধর্ম আছে তা নয়, সিংহলী আর তামিল এই দুই ভাষাও আছে। তার উপর আছে সত্যিকারের দুই জাতি বা রেস। তামিলরা দ্রাবিড়বংশীয় আর সিংহলীরা বলে তারা বঙ্গদেশের রাজকুমার বিজয়সিংহের বংশধর, সুতরাং আর্য। আর্য অনার্যের বৈদিক যুগের সেই বিরোধ আধুনিক যুগেও বিলুপ্ত হয়নি। সমুদ্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপে এখনো বিদ্যমান। সিংহলীরা ঠিক আর্য কি না সন্দেহ। বিজয়সিংহও ঐতিহাসিক পুরুষ নন। বৌদ্ধ পুরাণেই তাঁর

অস্তিত্ব। তিনি আর্য হলেও তাঁর বিয়ে হয়েছিল যাঁর সঙ্গে সেই রাজকন্যা কুবেনী তো আর্য ছিলেন না। তবে ওরা তামিলদের জাতভাই নয়, ওদের ভাষাও তামিলের সগোত্র নয়। ওদের বিশ্বাস ওরা সিংহ জাতি। যেহেতু ওদের পূর্বপুরুষ বিজয়সিংহের পিতা সিংহবাহু নাকি সিংহের ঔরসজাত। বাংলাদেশে সিংহ ছিল বলে কোথাও লেখে না। লোকের স্মৃতিতেও নেই। সিংহ ছিল গুজরাটে। এখনো আছে গির অরণ্যে। এই কারণে ও অন্যান্য কারণে কোনো কোনো পণ্ডিত অভিমত প্রকাশ করেন যে বিজয়সিংহ ছিলেন গুজরাটের রাজকুমার।

চেহারার দিক থেকে সিংহলীরা অনেকটা বাঙালীদেরই মতো। আর ওরা নিজেরাই তো আমার বন্ধু করুণাদাস গুহকে যে মানপত্র দিয়েছিল তাতে ছিল ওদের পূর্বপুরুষের আদিভূমি বঙ্গদেশের উল্লেখ। গত শতাব্দীতে যখন বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থান হয় তখন সিংহলের বৌদ্ধ প্রচারক অনাগারিক ধর্মপাল কলকাতাকেই বৌদ্ধধর্মের প্রচারকেন্দ্র মনোনয়ন করেন। সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় মহাবোধি সোসাইটি। যেমন মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয় থিয়সফিকাল সোসাইটি। তামিলদের সঙ্গে সাযুজ্য থাকলে মাদ্রাজই হতে পারত মহাবোধি সোসাইটির কর্মস্থল। দক্ষিণ ভারতও এককালে বৌদ্ধ প্রভাবাধীন ছিল। তাঁর দৃষ্টান্ত অজন্তা, অমরাবতী, নাগর্জুনকোণ্ডা। অজন্তার প্রভাব আমি লক্ষ করেছিলুম সিংহলের সিগিরিয়ার গুহাচিত্রে। কলকাতা কেন, মাদ্রাজ কেন নয়, তার উত্তর বোধহয় বুদ্ধগয়া আর সারনাথ মাদ্রাজ থেকে সুদূর। কলকাতা থেকে অদূর। আরো গভীর কারণ সিংহলের ইতিহাসে তামিলদের ভূমিকা সিংহলীদের পক্ষে মর্যাদাপূর্ণ নয়। কখনো তারা এসেছে রাজ্য জয় করতে, কখনো উপনিবেশ স্থাপন করতে, কখনো বাগানের শ্রমিকরূপে, কিন্তু বৌদ্ধ হতে নয়, সিংহলী হতে নয়। দেশের উত্তরাংশ এখনো তাদের অধিকারে রয়েছে। সেখানে সিংহলীদের সংখ্যা এক শতাংশ।

তামিলরা দাবী করে যে তারাই আগে এসে বসতি করেছে। সিংহলীরা পরে। দক্ষিণ ভারত তো লঙ্কাদ্বীপের নাকের ডগায়! বঙ্গদেশ বা গুজরাট বহুদূরে। কোন্‌টা বেশী স্বাভাবিক? তেমনি শৈব ধর্মই আগে, বৌদ্ধধর্ম পরে। তামিল ভাষা আগে, সিংহলী ভাষা পরে। তামিলরা সংখ্যায় পাঁচভাগের একভাগ। তা বলে তাদের দাবী খাটো নয়। ব্রিটিশ আমলে শিক্ষাদীক্ষায় ও চাকরিবাকরিতে সিংহের ভাগ ছিল সিংহলীদের নয়, তামিলদের। স্বাধীনতার বছর পনেরো আগে সর্বসাধারণের ভোট অধিকার প্রবর্তিত হয়। তখন আইন সভায় সিংহলীদের আধিক্য হয়। স্বাধীনতার

পর সরকার তাদেরই হাতে আসে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় স্কুল কলেজ আফিস আদালতে সিংহলীদের জন্যে সিংহের ভাগ। তাও সহ্য হতো, কিন্তু মেজরিটির চাপে সিংহলীদের ভাষাকেই করা হয় একমাত্র সরকারী ভাষা আর বৌদ্ধধর্মকে দেশের প্রধান ধর্ম। তার মানে দাঁড়ায় সিংহলীরাই প্রথমশ্রেণীর নাগরিক, তামিলরা দ্বিতীয় শ্রেণীর। এতে তাদের আত্মমর্যাদায় বাধে। তারাই বা কম কিসে? তারা ব্যাঘ্র জাতি। এই মনোভাব থেকে জন্মায় 'তামিল টাইগারস' নামক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী। তারা চায় স্বতন্ত্র তামিল 'ইলম'। তামিলস্থান। সিংহ বনাম ব্যাঘ্র।

বিশ্ববিদ্যালয়ে, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে তামিল ছাত্রদের অনুপাত অন্যায়ভাবে কমানো হয়। যাতে তারা পরে চাকরি না পায়। যেখানে ইংরেজী চালু রাখলেই শান্তি থাকত সেখানে সিংহলী চালাতে গিয়ে অশান্তি। ইংরেজীর উত্তরাধিকারী একমাত্র সিংহলী হবে কেন? তামিলও কেন হবে না? সে তো কম সমৃদ্ধ ভাষা নয়। অসামান্য তার সাহিত্য। প্রকারান্তরে বলা হলো ইংরেজের একমাত্র উত্তরাধিকারী সিংহলীভাষীরাই। তামিলরাও যেন উত্তরাধিকারী নয়। স্বাধীনতালাভের সময় কিন্তু এমন কোনো বাছবিচার ছিল না। প্রধানমন্ত্রী ডন স্টীফেন সেনানায়ক তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলীতে তামিলদেরও উচ্চস্থান দিয়েছিলেন। জুনিয়াস রিচার্ড জয়বর্ধনও ছিলেন তাঁরই দলে। প্রথম আট বছর কোনো গোলমাল ছিল না। সেটা শুরু হয় ১৯৫৬ সালে সলোমন ভাণ্ডারনায়কের আমল থেকে। ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টিকে ভোটে হারিয়ে দিয়ে শ্রীলঙ্কা ফ্রীডম পার্টি ক্ষমতাসীন হয়। অনেক সৎকাজ করে, কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে সিংহলীকে ও ধর্মের ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মকে নিষ্কণ্টক করতে গিয়ে তামিল হিন্দুদের আস্থা হারায়। অদৃষ্টের পরিহাস সলোমন ভাণ্ডারনায়ক নিহত হন এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর হাতে। অহিংসক বলে যারা প্রসিদ্ধ তাদেরই একজন এই মহামন্ত্রীনিপাত করে। হিংসার এই যে নজীর এটা এখন ব্যাপক হয়েছে। বৌদ্ধ জনতার মধ্যে হিংসার ছোঁয়াচ ছড়িয়ে গেছে। দাঙ্গাহাঙ্গামা এর আগেও বার কয়েক হয়ে গেছে, কিন্তু এবারকার মতো ভয়াবহ নয়। দাঙ্গা-বাজরা যেন গভর্নমেন্টের তোয়াক্কাই রাখে না। রাষ্ট্রপতি যেন সাক্ষীগোপাল।

ইতিমধ্যে দেশের নাম হয়েছে শ্রীলঙ্কা। প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে ক্ষমতা বেশী হয়েছে রাষ্ট্রপতির। এখন তিনি গভর্নর জেনারল নন, প্রেসিডেন্ট। এসব হলো সলোমন ভাণ্ডারনায়কের বিধবা পত্নী সিরিমাভোর কীর্তি। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ভারতের পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেন, সমাজতন্ত্রের দিকে মোড় নেন। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক

নিকটতর হয়। সিরিমাভোর আমলেই ভারতীয় তামিল চা-বাগান ও রাবার বাগান শ্রমিকদের কতককে শ্রীলঙ্কার নাগরিক অধিকার দেওয়া হয়। তাদের বঞ্চিত করেছিলেন ডন স্টীফেন। এখানে ব্যাখ্যা করা দরকার যে এই শ্রমিকরা ইংরেজদের বাগানের স্বার্থে আমদানী। এরা দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় শ্রমিকদের মতো কর্মস্থানেই থেকে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো এরাও নাগরিক অধিকার চায়, পায় ও হারায়। স্বাধীন হয়েই সিংহল সরকার এদের ভোটার তালিকা থেকে উচ্ছেদ করে। দেশ থেকেই উচ্ছেদ করত, যদি না বাগানের নয়া মালিকরা নিজেদের স্বার্থে এদের রাখতে চাইতেন। এরা যেমন কষ্টসহিষ্ণু সিংহলী শ্রমিকরা তেমন নয়। এরা চলে গেলে বাগান থেকে লাভ হবে না। চা আর রাবার রফতানী করেই তো সিংহলীরা বড়লোক। অথচ এ বেচারাদের ভোটের অধিকার দিতে কুণ্ঠিত।

এই তামিল শ্রমিকরা নয়া তামিল। বনেদী তামিল নয়। এদের কোনো রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ নেই, এদের ছেলেরা উচ্চশিক্ষা বা উচ্চপদ অভিলাষী নয়। এরা স্বতন্ত্র বাসভূমির স্বপ্নও দেখে না। সন্ত্রাসবাদে এদের মতি নেই। এদের কেউ তামিল টাইগার নয়। যেহেতু এরা আইন অনুসারে শ্রীলঙ্কার অধিবাসী নয় সেহেতু ভারত সরকারকেই এদের হয়ে শ্রীলঙ্কা সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাতে হয়। এদের জন্যে নৈতিক দায়িত্ব এখনো ভারতের। অপরপক্ষে বনেদী তামিলরা দু'হাজার কি আড়াই হাজার বছর আগে থেকে ভারত ছেড়ে লঙ্কায় বা সিংহলে বাস করে আসছে। তাদের প্রতি সহানুভূতি থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু তাদের জন্যে নৈতিক দায়িত্ব বা রাজনৈতিক দায়িত্ব ভারতের নেই। তারা বিদেশী। ভারতও তাদের কাছে বিদেশ। অধিকাংশ ভারতীয় এই তফাৎটা বুঝলেও তামিল নাডুর সাধারণ মানুষ বোঝে না। ইতিমধ্যেই তারা একটা বিশ্ব তামিল কংগ্রেস অনুষ্ঠিত করেছে। সেখানে মিলিত হয়েছে ভারতের, শ্রীলঙ্কার, বর্মার, মালয়েশিয়ার, সিঙ্গাপুরের ও অন্যান্য স্থানের তামিলরা। সিঙ্গাপুরের চারটি সরকারী ভাষার একটি হচ্ছে তামিল। আর তিনটি ইংরেজী, মালয়ী, চীনা। মালয়েশিয়ার তামিলদের এত প্রভাব যে একজন তামিল হিন্দুকে দেওয়া হয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ আর তিনি হন রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভ্য। ভারতীয়দের কেউ যা কখনো হননি।

লঙ্কাদ্বীপে সংখ্যালঘু হলেও তামিলদের গর্বের যথেষ্ট কারণ আছে। অমন একটি গর্বিত জাতি সিংহলীদের করুণার উপর নির্ভর করে থাকতে পারে না। যেমন চায়নি অবিভক্ত ভারতের গর্বিত মুসলমান 'জাতি' হিন্দুদের করুণানির্ভর

হতে। তা হলে কি এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান তামিলদের জন্যে স্বতন্ত্র বাসভূমি? তামিল 'ইলম'? তামিলস্থান? এ রকম একটা সিদ্ধান্ত নেবার আগে দশবার ভাবতে হবে। শ্রীলঙ্কা ক্ষুদ্র দ্বীপ। তামিলভাষী অঞ্চলটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। তামিলরা তার বাইরেও ছড়িয়ে আছে ও ব্যবসাবাণিজ্যে টেক্কা দিচ্ছে। তাদের সবাই কিছু চাকরিজীবী নয়। তামিলভাষী রাষ্ট্রে তাদের ভবিষ্যৎ নেই। দেশ ভাগ হয়ে গেলে তারা সিংহলীভাষী রাষ্ট্রে বিদেশী বলে গণ্য হবে। বিতাড়িত হবে। তামিল-ভাষী রাষ্ট্র স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে কী করে? ট্যাক্স দেবে কে? রফতানীযোগ্য পণ্য কোথায়?

অপরপক্ষে শ্রীলঙ্কা সরকারকেও মনে রাখতে হবে যে তামিল এলাকায় সিংহলী-দের জায়গা জমি দিয়ে উপনিবেশ পত্তন করাও কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। এই কর্মটি করা হচ্ছে সেচ প্রকল্পের নাম করে। তামিলদের বিক্ষোভের এটাও একটা কারণ। ইতিমধ্যেই তামিল এলাকায় নানা উপলক্ষে বিস্তর সিংহলী উপস্থাপিত হয়েছে। এতে তামিলদের গাত্রদাহ ও স্বার্থহানি। সমগ্র দ্বীপে তামিলরা সংখ্যা-লঘু হলেও কয়েকটি জেলায় তারা সংখ্যাগুরু। সেই কয়েটি জেলায় তাদের সংখ্যা-লঘুতে পরিণত করতে গেলে তারা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করবেই। যদিও সরকারের অভিপ্রায় হয়তো তাদের সংখ্যালঘুতে পরিণত না করা। কিংবা তাদের বসবাসের জায়গা সংকীর্ণ না করা।

জয়বর্ধন রেফারেণ্ডাম করে পার্লামেণ্টের কার্যকাল আরো ছ'বছর বাড়িয়ে নিয়েছেন। সেইসঙ্গে আপনার স্থিতিকাল। কিন্তু তামিলরা যদি পার্লামেণ্ট বয়কট করে তবে তাদের অনুপস্থিতিতে আইনকানুন, বাজেট ইত্যাদি পাস করা যেন খালি মাঠে গোল দেওয়া। দুনিয়ার লোক হাসবে। আর যাই করুন তামিল সন্ত্রাসবাদীদের 'লিকুইডেট' করতে সিংহলী সৈন্য পাঠাবেন না, পাঠালে ওরাও মরবে, এরাও মরবে। কেউ বেশী কেউ কম। জনতাও উত্তেজিত হয়ে প্রতিশোধ নেবে। কোনো সভ্যদেশ জনতার হাতে নিরপরাধের প্রাণদণ্ড সমর্থন করে না। জেলখানায় আটক বন্দীদের খুন করে জেল কয়েদীরা, এমন কথা কেউ কোথাও শোনেনি। তাও একজন দু'জন নয়, বাহান্ন জন। তাদের মধ্যে জনা তিনকে বাদে আর সকলেই বিচারাধীন বা বিচারবিহীন। একজন কি দু'জন গান্ধীবাদী। জয়বর্ধনের দ্বিতীয় ছ'বছর কি এমনিভাবেই কাটবে?

বলতে পারা যায়, তামিলরা সন্ত্রাসবাদীদের প্রশ্রয় দেয় কেন? হয়তো এইজন্যে

যে ওরা তামিলদের স্বাধিকারের জন্যে জান কবুল করে লড়ছে। আর কারো অত সাহস বা ত্যাগশক্তি নেই। কিন্তু সরকার যদি কেবলমাত্র সিংহলীদের সরকার হয়ে থাকে, আর্মি যদি কেবলমাত্র সিংহলীদের আর্মি হয়ে থাকে, পুলিশ যদি শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সিংহলীদের হয়ে থাকে তবে তামিলদের প্রতিরোধ একভাবে না একভাবে আত্মপ্রকাশ করবেই। গান্ধীবাদী ধারাও ধরতে পারে। মার্কসবাদী ধারাও ত্যাজ্য নয়। সারা দেশে না হোক কতক অঞ্চলে প্রশাসন অচল হয়ে যেতে পারে। একমুঠো সন্ত্রাসবাদী তখন এক হাজার কি দু'হাজার গেরিলায় পরিণত হবে।

যেদেশে সংখ্যাগুরু আর সংখ্যালঘুর জাতি আলাদা, ধর্ম আলাদা ভাষা আলাদা সেদেশের ঐক্যের একমাত্র শর্ত পার্টি এক ও সরকার এক। সেনানায়ক সেটা বুঝ-তেন, জয়বর্ধন সেটা বোঝেন না। তাঁর প্রথম কাজ হবে তামিলদের আস্থা অর্জন করা। তারা যেন বিশ্বাস করে যে তাঁর সরকার তাদেরও সরকার। দ্বিতীয় কাজ হবে কানাডা বা বেলজিয়ামের মতো শ্রীলঙ্কাকে একটি দ্বিভাষী রাষ্ট্র করা। একভাষী রাষ্ট্র করতে গেলে দেশকে দু'ভাগ করতে হবে। সিঙ্গাপুরে যদি চারটে ভাষা সরকারী ভাষা হয় শ্রীলঙ্কার কেন তিনটে ভাষা সরকারী ভাষা হবে না? সিংহলী, তামিল ও ইংরেজী? শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধধর্ম ছাড়া আরো তিনটি ধর্ম আছে। হিন্দু, মুসলিম ও খ্রীস্টান। রাষ্ট্র যদি ধর্মনিরপেক্ষ হয় তা হলে বৌদ্ধদের এমন কিছু ক্ষতি হবে না অথচ অন্যান্যদের আস্থা বাড়বে। সরকার চলে আস্থার জোরে, তলোয়ারের জোরে নয়, কারাগারের জোরে নয়। যেদেশে গণতন্ত্র আছে সেদেশে মেজরিটির শাসন হচ্ছে রাজনৈতিক মেজরিটির শাসন, সাম্প্রদায়িক মেজরিটির নয়, ভাষাভিত্তিক মেজরিটির নয়, জাতিভিত্তিক মেজরিটির নয়।

বার্মায় এই ভুলটি করেছিলেন উ নু। তার ফলে তাঁর বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান হয়। ক্ষমতা দখল করেন সেনাপতি নে উইন। বার্মা আবার ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয়। জাতিনিরপেক্ষ দেশ হয়। কারেন, শান প্রভৃতি জাতি শান্ত হয়। কারেনরা খ্রীস্টান। শেষপর্যন্ত শ্রীলঙ্কাতেও একটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটতে পারে। জয়বর্ধন বলছেন যে চক্রান্তকারীদের উদ্দেশ্যই ছিল তাই। তেমন কিছু যদি হয় তিনি বিদেশ থেকে সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করতে পারেন, কিন্তু কেউ তাঁর ডাকে সাড়া দেবে না। কারণ বিশ্বের জনমত এখন তাঁর দিকে নয়। অত্যাচারিত সংখ্যালঘুদের দিকে। তিনি যদি তাঁর ক্রুট মেজরিটি দিয়ে মাইনরিটিকে সায়েস্তা করতে চান তবে বুঝতে হবে তাঁর নৈতিক অধিকার এখন শূন্যের কোঠায়। তাঁর উচিত অবিলম্বে তামিল

প্রতিনিধিদের সঙ্গে গোল টেবিল বৈঠকে বসা ও সবাই মিলে একটা রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বার করা। ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। অখণ্ড শ্রীলঙ্কা যদি কাম্য হয়ে থাকে তার জন্যে সিংহলীদের কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। ভাষা আর ধর্ম আর জাতি এই তিনটি বিতর্কিত বিষয়ে গোঁড়ামি ছাড়তে হবে। পক্ষান্তরে তামিলদেরও ভারতের মুখাপেক্ষী হওয়া চলবে না। ভারত তাদের রক্ষক নয়। ভারত রামচন্দ্রের মতো লঙ্কায় গিয়ে তাদের সীতার মতো উদ্ধার করতে পারবে না। তাদের উদ্ধার করে রাখবেই বা কোন অযোধ্যায় ?

সিংহলীদের আর কোনো হোমল্যাণ্ড নেই, তারা দেয়ালে পিঠ রেখে লড়বে। ভারত যদি যুদ্ধে নামে বিশ্বের জনমত সিংহলীদের দিকেই যাবে। তামিলরা যদি ভারতের দিকে তাকায় তা হলে বুঝতে হবে তাদের অন্য একটা হোমল্যাণ্ড আছে। তারা নিজেরা সিংহলীদের মতো মরীয়া হয়ে লড়বে না। প্রত্যাশা করবে ভারতীয়রাই তাদের হয়ে লড়বে। দক্ষিণ ভারতের কতক তামিল নেতা স্বাভাবিক কারণেই উত্তেজিত। কিন্তু ভারত দেশটা কেবল তামিলদের নয়, ভারত সরকার কেবলমাত্র তামিল সেন্টিমেণ্টের দ্বারা চালিত হতে পারেন না। সব দিক বিবেচনা করে কাজ করতে হবে। তা না হলে সিংহলীরা ভারতের চিরশত্রু হবে। শ্রীলঙ্কা আকারে ক্ষুদ্র হলেও তার অবস্থানিক গুরুত্ব অত্যধিক। ইউরোপ থেকে চীন, জাপান, ইণ্ডোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়াগামী জাহাজ কলম্বো হয়ে যায়। কলম্বো হয়ে ফেরে। নৌঘাঁটি হিসাবে ত্রিঙ্কোমালির গুরুত্ব সমধিক। সে ঘাঁটি যদি বিদেশীদের কবলে পড়ে তা হলে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত। ভারত মহাসাগরে শ্রীলঙ্কা হচ্ছে ভারতের পাহারাদার। কিন্তু ভারত যদি তাকে ঘাঁটায় সে বিদেশীদের ঘাঁটি দেবে।

পরিশেষে একটি কথা বলি। সিংহলীই হচ্ছে ভারতীয় বৌদ্ধদের শেষ আশ্রয়। বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে নির্বাসিত হয়ে সেইখানেই আশ্রয় নিয়েছে ও এতকাল বেঁচে আছে। বৌদ্ধধর্মের যেটি আদিরূপ সেই থেরবাদ বা হীনযান শ্রীলঙ্কাতেই বিদ্যমান। অনুরাধপুরের বোধিবৃক্ষ দু'হাজার বছরের পুরনো। অনুরাধা নয়, অনুরাধ। আর কাণ্ডিতে তো বুদ্ধের দন্ত সংরক্ষিত হয়েছে। বুদ্ধ, বুদ্ধদেব নয়। বুদ্ধ সব দেবতার ঊর্ধ্বে। অথচ মানব। সেইখানেই বৌদ্ধধর্মের মহত্ত্ব। আর একটি কথা। সিংহলের বৌদ্ধদের প্রায় সকলেরই একটি বা দুটি করে খ্রীস্টান নাম আছে। কারো কারো পদবীও। ডন স্টিফেন সেনানায়ক, ডাডলী সেনানায়ক, সার জন কোটেলাওয়ালা,

সলোমন ভাণ্ডারনায়ক, জুনিয়াস রিচার্ড জয়বর্ধন এঁরা সবাই বৌদ্ধ। জয়বর্ধন সিংহলী-দের মতো লুঙ্গি পরেন। এককালে দারুণ সাহেব ছিলেন। আর ভাণ্ডারনায়ক ছিলেন আগে খ্রীস্টান, পরে বৌদ্ধ হন।

আদিবাসীদের কথা

আদিবাসীরাই এদেশের আদিম অধিবাসী। যখন আর্যভাষীরা এদেশে ছিল না তখন সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ প্রভৃতি ট্রাইবগুলি ছিল। এরা যে এতদিন টিকে আছে তার কারণ এরা বাঘ ভালুকের মতো জঙ্গলে বাস করত। বনে বসত করলেও সেখানে ঝুম পদ্ধতিতে চাষ করত। ত্রিপুরার এক টিপ্রী কলকাতায় এসেছিলেন শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্তের সম্মেলনে। আমাকে বলেন, "আমরা বাঁচব কী করে? ঝুম চাষ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জঙ্গল সাফ করে গাছগুলো নদীর জলে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দেশ স্বাধীন হয়ে আমাদের কী লাভ হয়েছে?" একই নালিশ সকলের মুখে। দেশকে শিল্পায়িত করতে গিয়ে বনজঙ্গল ধ্বংস করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে আদিবাসীদেরও হাজার হাজার বছরের নিরাপদ আশ্রয়। জলের মাছ ডাঙায় বাঁচে না। তেমনি আদিবাসীরাও চারদিকে গজিয়ে ওঠা শহরে বা শহরতলীতে বাঁচবে না। প্রাণধারণের জন্যে ওদের যা যা দরকার তার ঘাটতি হলে পূরণ করবে কে? কী কী দিয়ে?

আমার তরুণ সাহিত্যিক বন্ধুরা আদিবাসী এলাকায় ঘুরে ঘুরে যা দেখেছেন তা আমাকে শুনিয়েছেন। তাঁদের বিবরণ কোনো বনেদী পত্রিকায় ছাপা হয় না। ছোট ছোট পত্রিকায় মাঝে মাঝে বেরোয়। আমাকে সেরকম কিছু লেখা পড়তে দেওয়া হয়। আদিবাসী হলে আমি নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করতুম। আমার লেখনীর মুখে সেটা শোভন হবে না। আমি তো সরে জমিনেও যাইনি। সভ্যতাগর্বিত সরকারী কর্মচারীদের কাছে তারা যে ব্যবহার পায় তা প্রায় হিন্দুসমাজের অন্ত্যজদের মতো। যদিও তারা হিন্দুসমাজভুক্ত নয়। তাদের আলাদা এক ধর্ম আছে। ইংরেজীতে যাকে বলে অ্যানিমিজম। হিন্দু ডাক্তার বা সেবিকা তাদের স্পর্শ করবেন না। তারা এতই অশুচি! শিক্ষকশিক্ষীকাদেরও একই মনোভাব। খ্রীস্টান মিশনারীদের সঙ্গে এঁদের কত না তফাৎ!

বনে বাস করলে কেউ বনমানুষ হয় না। তাদের বুনো বলা বা মনে করা অন্যায়। মুনি ঋষিরাও বনে বাস করতেন। কেনই বা আমরা আশা করব যে সকলেই

বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোক হবে? আর সেটাই কি আদর্শ? কাউকে সভ্য করার মহান ব্রত কেউ আমাদের উপর অর্পণ করেননি। সেবা করতে বা শিক্ষা বিতরণ করতে যাঁদের নিযুক্ত করা হয় তাঁরা প্রত্যেকের সঙ্গে সমান ব্যবহার করবেন। মহাপুরুষেরা একবাক্যে বলে গেছেন, অপরের কাছে যে রূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর অপরের সঙ্গেও সেইরূপ ব্যবহার করবে। এখন এমন হয়েছে যে আদিবাসী ছেলেমেয়েরা তাদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত স্কুলে আসতেই চায় না। হাসপাতাল যারা আসে তারাও অপমান বোধ করে। এখানে শ্রেণীগত শোষণের প্রশ্ন ওঠে না। প্রশ্নটা জাতিগত বা বর্ণগত উচ্চনীচ বৈষম্যের। ওরা যেন আফ্রিকার নেটিভ আর এঁরা যেন আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ।

এর ফলে যদি ঝাড়খণ্ড আন্দোলন দানা বাঁধে তবে সেটা কি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন? অমন অবস্থায় পড়লে কে না স্বতন্ত্র রাজ্য বা রাষ্ট্র চায়? আদিবাসীদের এলাকায় কাজ করতে যাঁদের পাঠানো হবে তাঁদের কিছুদিন খ্রীস্টীয় মিশনারীদের কাছে শিক্ষানবীশ করে তালিম দিতে হবে। মিশনারীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে বিতাড়ন করা অন্যায়। তাঁদের অর্থবল সরকারের চেয়ে বেশী নয়, কিন্তু তাঁদের মমতাবোধ আমাদের শহুরে ভদ্রলোকদের চেয়ে বেশী। ধর্মান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আদি-বাসীদের মর্যাদা বৃদ্ধি হয়।

ঝাড়খণ্ড যারা চায় তারা ভারতীয় ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্য হিসাবেই চায়। সুতরাং তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী বলতে পারা যায় না। স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে তেলুগুভাষী অঞ্চলগুলি নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ গঠিত হয়েছে। মারাঠীভাষী অঞ্চলগুলি নিয়ে মহারাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। কন্নড়ভাষী অঞ্চলগুলি নিয়ে কর্ণাটক গঠিত হয়েছে। তখন তো বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিযোগ ওঠেনি। সাঁওতাল ও মুণ্ডাভাষী অঞ্চলগুলি নিয়ে ঝাড়খণ্ড গঠন করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। এই ধরণের দাবীর পেছনে রয়েছে আইডেনটিটির প্রশ্ন। প্রত্যেকেই চায় নিজস্ব আইডেনটিটি। বাঙালী ও কি তা চায় না? নেপালীও কি তা চায় না? তা ছাড়া আছে মাইনরিটির প্রশ্ন। "আমরা সর্বত্র মাইনরিটি হব কেন? কোনো একটি রাজ্যে মেজরিটি হব না কেন?" গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মাইনরিটি হয়ে গৌরব নেই। যে যেখানে পারে সেখানে মেজরিটি হতে চায়। ঝাড়খণ্ড হলে আদিবাসীরাই হবে সেখানকার মেজরিটি। তাদের কণ্ঠস্বর জোরালো হবে। আর তাদের আইডেনটিটি সুরক্ষিত হবে। তারা বাংলা বা হিন্দী বা ওড়িয়া মেজরিটির চাপে পড়ে বাঙালী বা হিন্দীওয়ালা বা ওড়িয়া বনে যাবে না।

তার পর এটাও অনেকের জানা নেই যে লর্ড কার্জনের বড়লাট হয়ে আসার আগে থেকেই বঙ্গভঙ্গের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। প্রথম পরিকল্পনা ছিল তখনকার বঙ্গপ্রদেশকে এমনভাবে ভাগ করতে হবে যে একটি ভাগে পড়বে বাংলা ও বিহার, আরেকটি ভাগে পড়বে ওড়িশা ও ছোটনাগপুর। তথা মধ্যপ্রদেশের কতক অংশ। যত দূর জানি নামকরণ হবে ঝাড়খণ্ড। এটি একটি পুরাতন নাম। মোগল আমলের চেয়েও পুরাতন। তার ধ্বংসাবশেষ হচ্ছে ঝাড়গ্রাম। ব্রিটিশ আমলের গোড়ায় সিংহভূম, মানভূম, মল্লভূম, বীরভূম প্রভৃতি নিয়ে জঙ্গলমহল বলে একটি অঞ্চল ছিল। জেলা ভাগ হয় তার অনেক পরে। জেলা জিনিসটাই ইংরেজদের সৃষ্টি। ভাঙতে ভাঙতে গড়তে গড়তে জেলাগুলির চেহারা এখনকার মতো হয়েছে। উদ্দেশ্য প্রশাসনিক সুবিধা।

প্রশাসনিক সুবিধার জন্যেই কার্জনের আগে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা তৈরি হয়ে রয়েছিল। কার্জন তার উপর খোদকারি করেন এই বলে যে প্রস্তাবিত প্রদেশ দুটির মাঝখানকার নৈসর্গিক সীমারেখা হবে পদ্মানদী। পদ্মানদীই তো তৎকালীন বঙ্গ-প্রদেশের বুক চিরে তাকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। আসামকে জুড়ে দিলেই তো কাজ চুকে যায়। তাঁর যুক্তিটাকে জোরালো করার জন্যে তিনি হিন্দু মুসলমানের ধর্মভেদে মেজরিটি মাইনরিটির দোহাই দেন। মুসলমানরা প্রায় সব ক'টা প্রদেশেই মাইনরিটি হবে কেন? কয়েকটা প্রদেশে তাদের মেজরিটি বানিয়ে দেওয়া হোক। এই কার্জনই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে পাঞ্জাবের থেকে আলাদা করার অজুহাতে পাঞ্জাব ভঙ্গ করেন। তাঁর হাতে মুসলিমপ্রধান প্রদেশের সংখ্যা দাঁড়ায় তিন। পাঞ্জাব. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পূর্ববঙ্গ ও আসাম। হিন্দুপ্রধান প্রদেশের সংখ্যা পাঁচ। বেঙ্গল, বম্বে, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ। পরবর্তীকালে বঙ্গভঙ্গ এক অর্থে রদ করা হয়, আরেক অর্থে বহাল করা হয়। পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ মিলে যায়, কিন্তু বিহার ওড়িশা বেরিয়ে যায়। আসাম আবার পৃথক হয়। কিন্তু সুরমা উপত্যকা তার সামিল হয়। বঙ্গপ্রদেশ হয় মুসলিমপ্রধান। ভারতের রাজধানী সরে যায় দিল্লীতে।

এইসব রদবদলের ফলে ঝাড়খণ্ডে নাম চাপা পড়ে যায়। নইলে ঝাড়খণ্ড প্রদেশ কার্জনী আমলেই ভূমিষ্ঠ হতো। ভূমিপুত্রদের স্বার্থে নয়। প্রশাসনিক স্বার্থে। একজন ছোটলাটের পক্ষে সেকালের বিহার, ওড়িশা সমেত বঙ্গপ্রদেশের মতো বৃহদায়তন ভূখণ্ড শাসন করা অতি দুরূহ ছিল। আবার সেই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে এসেছে।

ম্যাউণ্টব্যাটেন

আমার নিয়তি আমাকে নিয়ে যায় অতিথিরূপে তেরো বছর আগে সিমলার সামার হিলে অবস্থিত সেই ঐতিহাসিক প্রাসাদটিতে যার নাম ছিল ভাইসরিগাল লজ, পরে হয়েছে রাষ্ট্রপতিনিবাস। সেখানে স্থাপন করা হয়েছে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অভ্ অ্যাডভান্সড স্টাডিজ। দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধকদের মহাতীর্থ।

এই অপ্রত্যাশিত সুযোগ আমাকে দেখতে দেয় সেই ঐতিহাসিক মহল যেখানে ১৯৪৭ সালের ১১ই মে তারিখে মাউণ্টব্যাটেন, নেহরু ও ভি. পি. মেনন মিলে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটিত পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দেন। বাকী থাকে প্রধান মন্ত্রী অ্যাটলীর অনুমোদন। তার জন্যে ছুটে যেতে হয় মাউণ্টব্যাটেনকে লণ্ডনে আকাশপথে। তার আগেই অ্যাটলী অন্য একখানি খসড়া মন্‌জুর করে রেখেছিলেন। তাই নতুন খসড়া দেখে চমকে ওঠেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নতুনটিকেই গ্রহণ করেন।

কাজেই সিমলার ভাইসরিগাল লজে ১১ই মে তারিখে যে দৃশ্য অভিনীত হয় সেই দৃশ্যই ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ করে। মাউণ্টব্যাটেনকে তাঁর সহকর্মীরা পরামর্শ দিয়েছিলেন আগের খসড়াটি কাউকে না দেখাতে। তিনি তাঁদের পরামর্শ লঙ্ঘন করে নেহরুকে দেখান। দেখাতেই জবাহরলাল বলেন, "এ ভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর চলবে না। এর ফলে ভারত হয়ে উঠবে বলকান।"

এটা কারো মাথায় আসেনি যে বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমান নেতারা যদি একমত হয়ে বাংলাদেশকে অবিভক্ত রাখতে চান ও অবিভক্ত বাংলাদেশ যদি ভারত তথা পাকিস্তানের থেকে বিচ্ছিন্ন একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হতে চায় তা হলে তার দেখাদেখি অন্যান্য প্রদেশও তেমনি স্বাধীন ও সার্বভৌম হতে চাইবে আর হায়দরাবাদ প্রমুখ দেশীয় রাজ্যগুলিও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। গান্ধী, শরৎচন্দ্র বসু ও সুহরাবর্দী যা চেয়েছিলেন তা অবিভক্ত ও স্বতন্ত্র বাংলাদেশ। বাংলার লাটেরও সেই সুপারিশ। মাউণ্টব্যাটেনের ইউরোপীয় সহকর্মীরা সেই মর্মে খসড়া তৈরি করেছিলেন। মাউণ্টব্যাটেন তাতে রাজী হয়েছিলেন। সেইভাবে মূল মাউণ্টব্যাটেন

পরিকল্পনা সংশোধিত হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস বা লীগ নেতাদের না জানিয়ে ও তাঁদের সম্মতি না নিয়ে। মাউন্টব্যাটেন যদি নেহরুকে সিমলায় আমন্ত্রণ না করতেন ও অ্যাটলীর কাছে পেশ করা খসড়াটি না দেখাতেন তা হলে পরে হৈ চৈ বেঁধে যেত। নেতারা বেঁকে বসতেন এই বলে যে ভারতের বলকানীকরণ তাঁরা মেনে নেবেন না।

হিন্দু মুসলমান একমত হলে বাংলাদেশ অবিভক্ত থাকত ও সেই অবস্থায় স্বাধীন হতো, এ রকম একটা বিকল্প যোগ করা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। দু'পক্ষেই সেদিন যেমন জঙ্গী মনোভাব, তাঁরা যে একমত হতেন এটা অবাস্তব আশাবাদ। তবু কে জানে। লীগের মতিগতি বদলে যেতেও পারত। বাংলাদেশ অবিভক্ত থাকলে আসাম কোণঠাসা হতো। সে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে চাইলেও চলাচলের পথ পেত না। আকাশপথে বহিঃশত্রুর হাত থেকে আসাম রক্ষা করতে পারা যেত না। বাংলাদেশের মতো আসামও কংগ্রেসের হাতছাড়া হতো। লীগের কবলে পড়ত। লীগ তাতে খুশি হতে পারে, কংগ্রেস খুশি হতো না। তবে বাস্তববাদীরা এটাও জানতেন যে সুহরাবর্দীর হাতে ক্ষমতা আসা মানে তাঁদের হাতে ক্ষমতা আসা নয়। সুহরাবর্দীকে তাঁরা লীগ দখল করতে দিতেন না। তাই কংগ্রেসের মতো মুসলিম লীগও অবিভক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনাশ করে।

এত কথা বলার কারণ এই যে ভারত ভাগের জন্যে মাউন্টব্যাটেন দায়ী হলেও বাংলা ভাগের জন্যে তাঁকে দায়ী করা উচিত নয়। গান্ধীজীকেও না। হিন্দু মুসলমান একমত হলে বাংলাদেশ অবিভক্ত থাকতে পারত। তা দেখে পাঞ্জাবও অবিভক্ত থাকতে পারত। তা দেখে ভারতও অবিভক্ত থাকতে পারত। অপর পক্ষে, বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হলে তার অনুসরণে হায়দরাবাদ, কাশ্মীর প্রভৃতি বহু স্বাধীন রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটত। তার ফলে ভারতের চেহারাটা হতো বলকান দেশগুলির মতো। কেন্দ্রীয় সরকার বলতে যেটা অবশিষ্ট থাকত সেটাকে তো ইংরেজরা প্যারামাউন্ট পাওয়ার বলে স্বীকৃতি দিত না। প্যারামাউন্ট পাওয়ার হওয়া নিয়ে লড়াই বেধে যেত।

যতরকম অশুভ সম্ভাবনা ছিল সব ক'টার হিসাব নিলে আমরা মাউন্টব্যাটেনকে দোষ দিতে পারিনে। ভারত ভাগও তাঁর আইডিয়া নয়। ওটা জিন্নার আইডিয়া। পরে জবাহরলাল ও বল্লভভাইয়েরও আইডিয়া। তাঁরা চেয়েছিলেন কংগ্রেস শাসিত ভারত। যেসব অঞ্চল কংগ্রেস শাসন মেনে নিত না, বিদ্রোহ করত, সেসব অঞ্চলকে

তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে দিতেন। বিচ্ছিন্ন হয়ে ওরা লীগ শাসনাধীন ও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতো। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাব ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে রাজী হতো না। তাদের পার্টিশন ছিল একান্ত আবশ্যক। সেটার জন্যে মাউণ্টব্যাটেনের মধ্যস্থতার প্রয়োজন ছিল। লীগকে তিনি রাজী করান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তথা সীলেট দিয়ে। এর জন্যে রেফারেণ্ডাম অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস রাজী। মাউণ্টব্যাটেন তাঁর মধ্যস্থতার মাশুল হিসাবে আদায় করে নিয়েছিলেন ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসে রাজীনামা। লীগ গোড়া থেকেই রাজী ছিল। কিন্তু কংগ্রেসের বামপন্থীরা ছিল নারাজ। সিমলাতেই মাউণ্টব্যাটেন নেহরুর কাছ থেকে আশ্বাস পান যে কংগ্রেস ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসে রাজী হবে। এই আশ্বাসটা বল্লভভাইয়ের কাছে পেয়েছিলেন ভি. পি. মেনন। কিন্তু আরেক মেনন ছিলেন এর বিপক্ষে। তিনি কৃষ্ণ মেনন। তিনিও তখন সিমলায়। নেহরু রাজী দেখে তিনিও রাজী। এদের লাভ হলো অবিলম্বে ক্ষমতার হস্তান্তর। মাউণ্টব্যাটেন যেন ঘোড়ায় চড়ে এসেছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ক্ষমতা হস্তান্তর করে সৈন্য সামন্ত নিয়ে ভারত থেকে অপসরণ করতে সকলের চেয়ে অধীর। ওদিকে নেহরুও কম অধীর নন। বল্লভভাইও চান ত্বরান্বিত হস্তান্তর। শাসনকার্য দিনকের দিন দুরূহ হয়ে উঠেছিল। বেশী দেরি করলে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যেত। ইংরেজ রাজকর্মচারীদেরও সেই মত।

ক্ষমতা হস্তান্তরের পর মাউণ্টব্যাটেন ব্রিটিশ নেভীতে ফিরে যেতে চান। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা তাঁকে যেতে দেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল লীগ নেতারাও তাকে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারল করবেন। কিন্তু বাদ সাধলেন জিন্না। দুই ডোমিনিয়নের একই গভর্নর জেনারল হলে দাঙ্গাহাঙ্গামা একেবারে বন্ধ না হলেও আয়ত্তাধীন হতো। তা না হয়ে যা হলো তার দরুণ মাউণ্টব্যাটেনের নাম খারাপ হয়ে গেল তাঁর নিজের দেশে। আর কাশ্মীরের মহারাজাকে তিনি কিছুতেই বোঝাতে পারলেন না যে কাশ্মীরকে একটা না একটা ডোমিনিয়নে যোগ দিতে হবে। তৃতীয় এক ডোমিনিয়ন সম্ভব নয়। তেমনি অবুঝ হায়দরাবাদের নিজামও। অন্যান্য রাজা মহারাজারা তাঁর কথা শোনেন। তাই দেশীয় রাজ্যগুলি সহজেই ভারতভুক্ত বা পাকিস্তানভুক্ত হয়। মাউণ্টব্যাটেন ভারতকে কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাতে দেন, কিন্তু জিন্না যখন সেখানে সৈন্য পাঠাতে উদ্যত হন তখন অকিনলেক বাধা দেন। ফলে পাকিস্তান বিষম অসন্তুষ্ট হয়। এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে বিবাদটা ইউনাইটেড নেশনসে না পাঠালে আন্ত-র্জাতিক যুদ্ধ বেধে যেত। তেমন পরামর্শ দিয়ে মাউণ্টব্যাটেন ভুল করেননি। সে

পরামর্শ গ্রহণ করে ভারত সরকারও ভুল করেননি। কাশ্মীর সমস্যার একতরফা সমাধান সামরিক উপায়ে সম্ভব ছিল না। কংগ্রেস নেতারা সেটা বুঝতেন। তাই গোটা কাশ্মীর জয় করতে চাননি। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর গভর্নর জেনারলের শাসন-ক্ষমতা ছিল না। মাউণ্টব্যাটেন সিদ্ধান্ত নেবার মালিক ছিলেন না। যার ক্ষমতা নেই তার দায়িত্বও নেই। তাঁকে দায়ী করা অনুচিত। অথচ কাশ্মীরের জন্যে তাঁকে দায়ী করা হয়। সেটা ঠিক নয়।

হায়দরাবাদের পুলিশ অ্যাকশনের পূর্বেই তিনি পদত্যাগ করে দেশে ফিরে যান। আমার মনে হয় না যে তিনি সেটা সমর্থন করতেন। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন নিজামের সঙ্গে একটা সম্মানজনক মিটমাট করতে. কিন্তু যাতে নিজামের সম্মান তাতে ভারত সরকারের অসম্মান ও যাতে ভারত সরকারের সম্মান তাতে নিজামের অসম্মান। নিজামের বিশ্বাস তিনি সাধারণ রাজা মহারাজা নন, তিনি স্বাধীন নৃপতি, যেমনটি ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

পার্টিশনের জন্যে মাউণ্টব্যাটেনকে দোষ দেওয়া অন্যায়। মুসলিম সেপারেটিজম তাঁর সৃষ্টি নয়। সেটা মুসলিম লীগের সৃষ্টি। মুসলিম লীগের পূর্বেও তার সৃষ্টিলক্ষণ দেখা যাচ্ছিল সার সৈয়দ আহমদ খানের কংগ্রেসবিরোধী কার্যকলাপে। ব্রিটিশ রাজের উত্তরাধিকারী হবে কংগ্রেস রাজ, তার মানে হিন্দু রাজ, এই সম্ভাবনা তাঁকে সনাতন ব্রিটিশ রাজত্বের পক্ষপাতী করেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্ব যদি সনাতন না হয় তা হলে হিন্দু রাজত্বকে ঠেকানো যাবে কী দিয়ে? এর উত্তর, মুসলিম রাজত্ব দিয়ে। সেকথা বললে আবার সিপাহী বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তির মতো শোনাবে। দিল্লীর সিংহাসন ছাড়া মুসলিম রাজত্ব কল্পনা করা যেত না। পাকিস্তানের আইডিয়াটা কারো মাথায় আসেনি। না মুসলমান, না ইংরেজ। এর জনক চৌধুরী রহমৎ আলী নামে এক ছাত্র। কবিবর ইকবাল এটা তাঁর কাছে পান। পরে জিন্না সাহেব এটাকে আপনার করে নেন। কিন্তু ১৯৪৬ সালেও তাঁর বিশ্বাস ছিল যে কংগ্রেসের সঙ্গে অখণ্ড ভারতের ভিত্তিতে একটা মিটমাট সম্ভবপর। কংগ্রেস কিছুতেই মওলানা আবুল কালাম আজাদ, খান্ আবদুল গফফার খান প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের ত্যাগ করে মুসলিম লীগের সঙ্গে মিটমাট করবে না, এটা হৃদয়ঙ্গম করে তিনি যৌথ রাজত্বের তথা দিল্লীর সিংহাসনের মায়া কাটান।

মাউণ্টব্যাটেনকে আমরা মনে রাখব পার্টিশনের বিধাতা রূপে নয়, কংগ্রেস-ব্রিটিশ মিটমাটের তথা লীগ-ব্রিটিশ মিটমাটের মধ্যমণি রূপে। যেটা তাঁর সাধ্যের বাইরে

ছিল সেটা কংগ্রেস-লীগ মিটমাট। সেক্ষেত্রে ওয়েভেলও ব্যর্থ, মাউন্টব্যাটেনও ব্যর্থ। এঁরা যে চেষ্টা করেননি তা নয়। সে চেষ্টা আন্তরিক ছিল।

মাউন্টব্যাটেনের মহাপ্রয়াণ মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণের সঙ্গেই তুলনীয়। আততায়ীর অস্ত্রেই তাঁদের উভয়ের নিধন। এ দুটি যেন নিয়তির নির্দিষ্ট প্রতীকী ঘটনা। একজন ভারতের ও অপরজন ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। আমি শোকাকুল।

প্রবাসে বিপ্লবী জীবন

(চিন্মোহন সেহানবীশকে)

যেদিন আপনি আপনার লেখা "রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী" আমার হাতে দেন সেইদিনই বাড়ী ফিরে আমি তার বেশ খানিকটে পড়ে ফেলি রাত জেগে। কোথায় লাগে তার কাছে উপন্যাস। আফসোস এই যে আমি নিজে এ বিষয়ে উপন্যাস রচনার যোগ্য পাত্র নই। অন্য কেউ যে লিখবেন তার সম্ভাবনা দেখছিনে। আপনার বইখানি উপন্যাসের সাধ মেটাবে। তার মানে এ নয় যে আপনি যা লিখেছেন তা ফ্যাক্ট নয়, ফিকশন। আমার বক্তব্য এই যে আপনার গ্রন্থ অবলম্বন করে একখানি বৃহৎ উপন্যাস রচনা করা যায়। উপন্যাসের ঘটনাস্থল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইডেন, রাশিয়া, আমেরিকা, জাপান, ইণ্ডোনেশিয়া।

বিষয়টিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাগ, রুশ বিপ্লবের পূর্বে। দ্বিতীয় ভাগ, রুশবিপ্লবের পরে। বিভাজন রেখা ১৯১৭ সাল। বিপ্লবপূর্বের বিপ্লবী যাঁরা তাঁরা জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রবিপ্লবী। দেশের স্বাধীনতাই তাঁদের অভিষ্ট। সেখানেই তাঁরা থামতেন। স্বাধীন দেশ কমিউনিস্ট হবে না সোশিয়ালিস্ট হবে না বুর্জোয়া ফিউডাল ক্যাপিটালিস্ট হবে সেটা পরবর্তী যুগের ভাবনা। আগে থেকে ভাবতে গেলে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়। কাজ এগোয় না। রুশ বিপ্লবোত্তর বিপ্লবী যাঁরা তাঁরা শুধুমাত্র রাষ্ট্রবিপ্লবেই ক্ষান্ত হবেন না, তাঁরা ঘটাবেন সমাজবিপ্লব। তাঁদের অভিষ্ট স্বদেশী বিদেশী সর্বপ্রকার শোষণহীন সমাজ। নতুন সোশিয়াল অর্ডার। মার্কস যার তত্ত্ব নির্ণয় করে গেছেন। লেনিন যাকে রূপায়িত করছেন।

জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের অনেকেই রুশবিপ্লবের পরে সমাজবিপ্লবী হন। রাশিয়ায় যান। কেউ কেউ সেদেশে থেকে যান। পরে স্টালিনের সন্দেহের শিকার হন। সন্দেহের মূল কারণ তাঁরা কাইজারশাসিত জার্মানীর সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে হাত মিলিয়েছিলেন। সেই যে 'অরিজিনাল সিন' সে কি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেই ধুয়ে মুছে যায়? ভারতের স্বাধীনতার জন্যে হিটলারশাসিত

জার্মানীর সঙ্গে হাত মেলানো কি একেবারেই অসম্ভব? না, তাঁদের বিশ্বাস করা যায় না। অতএব কোতল। বুদ্ধিমান মানবেন্দ্রনাথ অনাগতবিধাতার মতো আগেই স্টালিনের জাল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। দেশে ফিরে জেলে যেতে হলো। কিন্তু প্রাণে বাঁচলেন ও রায়পন্থী মতবাদের প্রবক্তা হলেন।

তবে রুশবিপ্লবকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি এমন বিপ্লবীও ছিলেন। তাঁরা রাশিয়ায় গেলেন না। ভারতেও ফিরলেন না। প্রবাসেই জীবনপাত করলেন। যেমন শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ও লালা হরদয়াল। শ্যামাজী নয়, শ্যামজী। রামকৃষ্ণকে কি কেউ রামাকৃষ্ণ বলে? মাদাম কামা দেশে ফিরলেন বটে, কিন্তু হাসপাতালে রোগে ভুগে প্রাণ দিতে। হরদয়ালের নাম এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকায় উঠেছে। জার্মানীতে বাস করে তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছিল, তুলনায় ইংরেজরা বহুগুণে শ্রেয়, এই সিদ্ধান্তের পর লণ্ডনে গিয়ে তিনি গবেষণায় নিযুক্ত হন। বক্তৃতা দিতে গিয়ে আমেরিকায় মারা যান। তারকনাথ দাস তো কালক্রমে মার্কিনভক্ত বনে গেলেন। স্বাধীনতার পরে তিনি ভারত ভ্রমণে আসেন। শান্তিনিকেতনে রথীবাবু একটি ডিনার দেন। আমাকে ও আমার স্ত্রীকেও ডাকেন। তাঁর সঙ্গে তর্ক বেধে যায় আমার স্ত্রীর। ভারতের রুশঘেঁশা নীতি তিনি সহ্য করতে পারেন না। ভারতও না শেষে লাল হয়ে যায়!

আপনার বইখানি আমার হাতে আসার পরে একদিন নজরে পড়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র শতবর্ষপূর্বের পৃষ্ঠায় ১৮৭৯ সালের ২৯শে মে তারিখে অক্সফোর্ড থেকে লেখা লণ্ডনের 'অ্যাথিনীয়াম' পত্রিকায় প্রকাশিত ডক্টর মনিয়ার উইলিয়ামসের পত্র।

"It may interest the readers of the Athenaeum to learn that a young Indian Pundit, named Syamaji Krishnavarma, who, considering his age (scarcely twenty-three) is remarkably well-versed in grammatical and Vedic literature, has recently arrived in this country, and has just been admitted a member of this University. He is the first real Indian Pundit who has ever visited England. We have had others here who have borne the name, but no real Sanskrit scholar has ever before had the courage to break the rules of caste, give offence to his own family, incur the odium and contempt of the whole fraternity

of his brother Pundits and expose himself to the certainty of excommunication on his return to India."

এর পরে এক অচেনা ভদ্রলোক একদিন আমার সঙ্গে আলাপ করতে করতে পুরাতন প্রসঙ্গ তোলেন ও আমার আগ্রহ দেখে আমাকে খান তিনেক বই পড়তে দিয়ে যান। তার একখানা হলো জেমস ক্যাম্পবেল কার প্রণীত "পলিটিকাল ট্রাবল ইন ইণ্ডিয়া ১৯০৭—১৯১৭।" এতে অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার কথাও আছে। তার থেকে কয়েকটি অজানা তথ্য তুলে দিচ্ছি।

"He graduated from Balliol College in 1882 and was called to the Bar in 1884. Returning to India he held high posts in one or two Native States, but was dismissed from Junagadh in September, 1895, and after this failed in his intrigues to obtain re-employment in Udaipur, where he had been a member of the State Council trom 1893 to January, 1895. Colonel Curzon-Wyllie was appointed Resident of Udaipur in March, 1884, and was instrumental in turning Krishnavarma out of the State at the beginning of 1895, and successfully opposed his return to State service in September of the same year. Krishnavarma, however, obtained employment in the private service of the Maharana, and when Lord Elgin visited Udaipur in November, 1896, Colonel Curzon-Wyllie refused to allow him to be presented at the Viceregal Durbar. Next year Krishnavarma left India and returned to London. (*Political Trouble in India : 1907-1917* by James Campbell Ker, page 155. Published by EDITIONS INDIAN, CALCUTTA, 1973)."

উপরের উদ্ধৃতি থেকে অনুমান করা শক্ত নয় যে কার্জন-উইলিই কৃষ্ণবর্মাকে দেশছাড়া করেন। বিলেতে বোধ হয় তিনি ন্যায়বিচার আশা করেছিলেন। পাননি। আইনসম্মত ভাবে ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি স্থাপন করেন। বিপ্লবী তিনি একদিনে হননি, ক্রমে ক্রমে হন। কার্জন-উইলির হত্যার বছর দুই পূর্বেই তিনি লণ্ডন ত্যাগ করে প্যারিসকেই করেছিলেন তাঁর কর্মক্ষেত্র। উক্ত ঘটনার সঙ্গে তাঁর

সংস্রব ছিল না। তবু তিনি 'টাইমস' পত্রিকায় চিঠি লিখে জানান,

"I frankly admit I approve of the deed and regard its author as a martyr in the cause of Indian independence."

তখনকার দিনে অর্থাৎ ১৯০৯ সালে 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স" কথাটা উচ্চারণ করার সাহস আর কারো ছিল কি? তাও খাস লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকায়? তবু এর থেকে প্রমাণিত হয় না যে তিনি ছিলেন ওই হত্যাকাণ্ডের পেছনে। ক্যাম্পবেল কার লিখেছেন,

"Though it was never proved in court, the whole circumstances leave little doubt that the murder of an Euglishman was planned by Savarkar in revenge for the sentencc passed on his brother, and that the particular victim was chosen to satisfy the private grudge of Krishnavarma." (*Ibid* page 165)

সম্ভবত এই কারণে কৃষ্ণবর্মাকে ব্রিটিশ সরকার আর ভারতে ফিরতে দেননি, যদিও তিনি জীবিত ছিলেন ১৯৩০ সাল অবধি রাজনীতি থেকে অনেক দূরে জেনেভায়। অনুমতি পেলে তিনি স্বদেশে ফিরে আসতেন ও স্বদেশের মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতেন। তবে তিনি অনুমতি চেয়েছিলেন কি না বলা যায় না। বোধহয় চাননি। গর্কি তাঁকে ১৯১২ সালে যে চিঠি লেখেন তাতে তাঁকে বলা হয়েছে ভারতের মাৎসিনি। মাৎসিনির মতো তিনিও ছিলেন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী।

জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী ভারতীয়দের মক্ষিরাণী ছিলেন মাদাম কামা। প্যারিসে অবস্থানকালেই তিনি ফরাসী সোশিয়ালিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। তাঁর মতবাদ দাঁড়ায় অন্যান্য সদস্যদের মতো সোশিয়ালিস্ট। রুশ বিপ্লবের পরে ঐ পার্টির অধিকাংশ সদস্য কমিউনিস্ট হয়ে যান। সংখ্যালঘু অংশ বেরিয়ে গিয়ে সোশিয়ালিস্ট পার্টি গড়েন। প্রশ্ন হলো, মাদাম কামা কি অধিকাংশের মতো কমিউনিস্ট হলেন না সংখ্যালঘুদের মতো সোশিয়ালিস্ট রয়ে গেলেন? এ প্রশ্নের উত্তর আপনি দিতে পারেননি। আপনিও জিজ্ঞাসু। তবে আপনার অনুমান তিনি কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। রুশ-বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি থাকা এক জিনিস, কিন্তু তেমনি একটি বিপ্লবের জন্যে কাজ করা আরেক জিনিস। যুদ্ধকালে তাঁকে ও রানাকে দক্ষিণ প্রান্তে অন্তরীণ করা হয়েছিল, এর থেকে প্রমাণিত হয় না যে সেটা রুশবিপ্লবের পূর্বে কমিউনিস্ট অর্থে

বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্যে। সেটা ন্যাশনালিস্ট অর্থে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের জন্যেই হওয়া সম্ভবপর। অন্তরীণ তো অ্যানি বেসান্টকেও করা হয়েছিল। যুদ্ধকালে হোম-রুল চেয়েছিলেন এই তাঁর অপরাধ। যুদ্ধের পরে মাদাম কামার জীবন রহস্যাবৃত। যেটুকু জানা যায় তার থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে তিনি রুশবিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হলেও তাঁর স্বদেশের বা বিদেশের কমিউনিস্টদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েননি। একান্ত নির্জনেই বাস করতেন। স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছিল। ভারতের স্বাধীনতাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তার অতিরিক্ত একটা স্বপ্ন একই জীবনে থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু দল নেই, বল নেই, ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, একটা পত্রিকা পর্যন্ত নেই, এমন অবস্থায় মার্কসবাদী বিপ্লবী হওয়া বিশ্বাসযোগ্য কি? মাদাম কামা সম্বন্ধে আরো গবেষণা চাই। তিনিই ভারতের বাইরে একমাত্র ভারতীয় বিপ্লবী নায়িকা। কমিউনিস্ট হওয়া না হওয়া অবান্তর।

প্যারিস থেকে কৃষ্ণবর্মা চলে যান জেনেভায়, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বার্লিনে। প্যারিসের গুরুত্ব থাকে না। আরো আগে লণ্ডনেরও গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল। জেনেভা নয়, বার্লিনই হয়ে ওঠে বিপ্লবীদের কেন্দ্র। ব্রিটেনের প্রধান শত্রু জার্মানী। অতএব ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রধান সহায় কিনা জার্মানীর যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণী। থীসিসটাই ভুল। যুদ্ধে যদি জার্মানরা জয়ী হতো ভারতের স্বাধীনতা এক কদমও এগোত না। সেই চোরাগলি থেকে বেরোবার একমাত্র পথ ছিল বার্লিন থেকে মস্কোর দিকে। তাও যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী জার থাকতে নয়। তাঁর পতনের পর যে পটপরিবর্তন ঘটে সেটাই ছিল ভারতীয় বিপ্লবীদের শেষ আশাভরসা। কিন্তু জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের মধ্যে ক'জনই বা রাতারাতি রং পরিবর্তন করে লাল হয়েছিলেন? যাঁরা হয়েছিলেন ও যাঁরা হননি তাঁরা কে কোন্ উদ্দেশ্যে সোভিয়েট অস্ত্রশস্ত্র চান? ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা তো নিজেরাই বুর্জোয়া, ব্রিটিশ রাজত্বের পরে তাঁদের রাজত্ব কি প্রোলিটারিয়ান ডিকটেটরশিপ হতো? যাঁরা কমিউনিস্ট মতবাদে রাতারাতি দীক্ষিত তাঁদের পক্ষেও সোভিয়েট সহায়তায় শ্রমিক কৃষকরাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর নয়। ট্রটস্কির মতো যাঁরা বিশ্বব্যাপী বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন তাঁরা হয়তো এঁদের আমল দিতেন। কিন্তু স্টালিনের মতো যাঁরা রুশদেশের বিপ্লবী শক্তিকে সর্বাগ্রে নিজের ঘরে সংহত ও অপরাজেয় করতে চান তাঁরা তাকে অসময়ে বাইরে ছড়িয়ে দেবার বিরোধী। স্টালিন যখন একনায়ক হয়ে বসেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের তো কথাই নেই, কমিউনিস্ট বিপ্লবীদেরও অস্ত্রশস্ত্র লাভের

শেষ আশাভরসা শিকেয় তোলা থাকে। যদি কোনোদিন পাশ্চাত্য ক্যাপিটালিস্টদের সঙ্গে রুশ কমিউনিস্টদের যুদ্ধ বাধে তবে সেইদিন রুশ অস্ত্রশস্ত্র ভারতের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের ভাগ্যে শিকে থেকে নামবে।

যুদ্ধ একদিন বাধল ঠিকই। কিন্তু সে যুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের মিত্র ধনতন্ত্রী ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা। দুনিয়ার সব কমিউনিস্ট তখন সর্বাগ্রে চায় ফাসিস্টদের পতন। ভারতের স্বাধীনতা তখন বহু দূরের প্রশ্ন। সমাজবিপ্লব তো ভাবনাচিন্তার বাইরে। মস্কো তখন আর ভারতীয় বিপ্লবীদের ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিপ্লবের তোড়জোড় করার কেন্দ্র নয়। তেমন কিছু করতে গেলে ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্সই তাঁদের সোভিয়েট ইনটেলিজেন্সের হাতে ধরিয়ে দেবে। তখন এ জীবনে আর তাঁদের দেখা পাওয়া যাবে না। হয় তাঁদের হাত পা বাঁধা। নয় তাঁদের জান খতম।

না জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী, না সমাজতন্ত্রবাদী বিপ্লবী কেউ অস্ত্রশস্ত্র আহরণ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সম্মুখ সমরে বা গেরিলা যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারেননি। এর জন্যে তাঁদের খাটো করা যায় না। লেনিন প্রভৃতির সুবিধা ছিল এই যে রাশিয়া থেকে সুইটজারল্যাণ্ড বা ফ্রান্স তেমন কিছু দূরে নয়, ভারত থেকে যেমন। তাই রাশিয়ার জনগণের নাড়ীর সঙ্গে তাঁদের যোগ ছিল। সর্বদাই রাশিয়া থেকে লোকজন গিয়ে তাঁদের সঙ্গে শলা পরামর্শ করতেন। ভারত থেকে প্যারিস, বার্লিন, মস্কোর দূরত্ব বহুগুণ বেশী। প্রবাসী বিপ্লবীরা দেশের জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন। জনগণও তাঁদের থেকে।

আপনার এই গ্রন্থ একটি অপূর্ব চিত্রশালা। বিপ্লবীদের প্রতিকৃতি যেমন মূল্যবান তেমনি তাঁদের চরিত্রচিত্রণ। এইসব মানুষ ভুলই করুন আর ঠিকই করুন এঁরা ঘর ছেড়ে, দেশ ছেড়ে, মা বাপ ছেড়ে, স্ত্রীপুত্র ছেড়ে, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে সাগর পাড়ি দিয়েছেন, গিরিসঙ্কট পার হয়েছেন, শীতে কেঁপেছেন, ক্ষুধায় ভুগেছেন। নিশ্চিত আয় কারো ছিল না। নিরাপদ জীবিকাও না। নারীর প্রেম কারো কারো ভাগ্যে জুটেছিল, নইলে বিদেশপ্রবাস দুঃসহ হতো। যাঁরা ফিরে আসতে পারলেন না তাঁদের হোমসিক হয়েই বাকী জীবনটা কাটাতে হলো। বিদেশের মাটিতেই দেহরক্ষা করতে হলো। যখনি এসব কথা ভাবি তখনি মাথা আপনি নুয়ে আসে। বলে উঠি, "বন্দে!" হাত যোড় করে নমস্কার করি।

বধূদাহ

দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে আমাদের অনেকের মনে এই আশাঙ্কা ছিল যে স্বাধীন ভারত হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের প্রভাবে পড়ে সতীদাহ ফিরিয়ে আনবে। এতদিন সেই পবিত্র কর্তব্য সম্পন্ন হয়নি দেখে নিশ্চিন্ত ছিলুম। কিন্তু এখন দেখছি সেই সনাতন প্রথাই অন্যভাবে ও অন্য নামে প্রত্যাগত হয়েছে। এবার তার নাম বধূদাহ। কেবল স্বামী মহাপ্রভু নন, পরিবারের সবাই এই যজ্ঞে অংশগ্রহণ করেন। মহিলারাও। খেয়াল নেই যে তাঁদের কুমারী কন্যারাও একদিন বধূ হবেন. তখন তাঁদের বেলাও অনুষ্ঠিত হবে বধূমেধ যজ্ঞ। ইতিমধ্যে এই প্রথা দিল্লীতেই সব চেয়ে ব্যাপক হয়েছে। যেখানে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর অধিষ্ঠান। বলা বাহুল্য তিনিও একজন মহিলা।

সতীদাহের অন্তরালেও পতির সম্পত্তিঘটিত ব্যাপার ছিল। সেটা চাপা দেওয়া হতো শাস্ত্রের দ্বারা। ইউরোপেও চার্চের আদেশে মানুষকে পুড়িয়ে মারা হতো। তা ছাড়া নারীকে পুড়িয়ে মারা হতো ডাইনী সন্দেহে। এটা চার্চের আদেশে নয়. জনতার আক্রোশে। অষ্টাদশ শতাব্দীর 'এনলাইটেনমেণ্ট' নামক অন্দোলনের কল্যাণে শিক্ষিত জনমানসে যে জাগরণ আসে তার ফলে এসব অন্যায় ক্রমে ক্রমে রহিত হয়। সেই আন্দোলনেরই সংস্পর্শে এসে রামমোহন সতীদাহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামেন। গভর্নর জেনারল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ইউরোপীয় এনলাইটেনমেণ্টের সন্তান। সতীদাহের মতো সনাতন প্রথার বিপক্ষে যেতে তাঁর সাহস হতো না. যদি না দেখতেন যে হিন্দু সমাজের ভিতর থেকেই সতীদাহ বন্ধ করার দাবী উঠছে। অবশ্য পাল্টা দাবীও ছিল। সে দাবী আরো জোরালো। বেণ্টিঙ্ক তাতে দমে যাননি।

সতীদাহ আসলে সতীত্বের অগ্নিপরীক্ষা। সীতাকে একবার সে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। কিন্তু অযোধ্যার লোকের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে রামচন্দ্র যখন তাঁকে বিনা দোষে বনবাসে পাঠান তখন তাঁর মধ্যে বিদ্রোহের ভাব জাগে। প্রজার মনোরঞ্জনের জন্যে আবার যখন অগ্নিপরীক্ষার কথা ওঠে তখন তিনি দেহত্যাগ করাই শ্রেয় বিবেচনা করেন। পাতালপ্রবেশ বলতে স্বেচ্ছা দেহত্যাগই বোঝায়। তার মানে

আত্মহত্যা। সেটাও একপ্রকার বধূদাহ। দ্বিতীয় বার অগ্নিপরীক্ষায় রাজী হলে তিনি হয়তো পুড়েই মরতেন। আমাদের সেই ঐতিহ্য এখানো মন থেকে যায়নি। স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিয়ে পড়লে এখনো আমরা ভক্তিতে আপ্লুত হই। আহা, কত বড়ো সতী! যেন আর কেউ সতী নয়। এতে মৃতার গৌরব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবিতা বিধবাদের অগৌরবও বাড়ে। আর মৃতাই বা কেমন করে জানলেন যে তাঁর স্বামীর স্বর্গলাভ হবে, সুতরাং তাঁরও? স্বামী যদি মহাপাপী হয়ে থাকেন ও নরকে যান তবে সতীও কি নরকে যাবেন? বোধ হয়, তা না হলে তিনি সতী কিসের?

সতীদাহের বদ্ধমূল সংস্কার গণমানস থেকে উৎপাটিত হয়নি। ভারতের এনলাই-টেনমেণ্ট গভীর স্তরে প্রবেশ করেনি। বধূদাহ তারই প্রকারভেদ। বধূকে পীড়াপীড়ি করা হয় আত্মহত্যা করতে। সে তাতে নারাজ হলে বধূহত্যা। কিন্তু এর মূলে কি থাকে পণযৌতুকের অপ্রাপ্তি বা অর্ধপ্রাপ্তি? সব সময় তা নয়। বধূর মস্ত অপরাধ সে বন্ধ্যা কেন? অথবা পুত্রসন্তানের জননী হচ্ছে না কেন? বংশরক্ষার কী উপায়? পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুত্রের নামেই তো বংশের নাম। শাস্ত্রে লিখেছে পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনাৎ। পিণ্ড না পেলে পিতা পিতামহ প্রভৃতি পরলোকে ক্ষুধার্ত হয়ে থাকবেন। সুতরাং সতী নারীকেও পুত্রজননী না হওয়ার অপরাধে সপত্নীজ্বালা পোহাতে হয়। স্বামী কর্তব্যের দায়ে আর একটি বিয়ে করেন। স্বেচ্ছায় নয়, পিতামাতার আদেশে। ইদানীং বহুবিবাহ প্রথা আইন করে বন্ধ করা হয়েছে। আইন অনুসারে প্রথম স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করার উপায় নেই। তবে উপযুক্ত কারণ থাকলে প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার দুয়ার এখন খোলা। সেরা উপায় হচ্ছে স্ত্রীর উপর এমন অত্যাচার করা যাতে সে নিজেই তালাক চাইতে আদালতের দ্বারস্থ হয়। তালাকের মামলা এত বেশী বেড়ে গেছে যে বিচারকরা হিমশিম খাচ্ছেন। গোপনীয় কারণটা পুত্রসন্তানের জন্ম না দেওয়া। এমনও হয় যে ছেলে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মায়ের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। অপরাধ শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা না করা বা অবাধ্য হওয়া।

আদালত যদি তালাক দিতে বাধা দেন তা হলে বৌকে পরলোকে পাঠানো ছাড়া আর কী উপায় আছে? তার বাপের বাড়ী পাঠালে তো আর একটি বিয়ে করতে পারা যাবে না। বহুবিবাহ রদ করার সময় আমরা কেউ এটা ভেবে দেখিনি। আমাদের পূর্বপুরুষরা বহুদর্শী ছিলেন। অম্লানবদনে আর-একটি কেন আরো দশটি বিবাহ করতেন। সেসব দিন আর নেই। তাঁদের বংশধররা আজকাল একটিও বিয়ে

করতে চান না। বিবাহমাত্রকেই তাঁরা ভয় করেন। বহুবিবাহ দূরের কথা। কন্যার পিতা হতে তাঁদের সাহস হয় না। কত খরচ!

কন্যারাও আজকাল স্বতন্ত্র জীবিকা তথা স্বতন্ত্র উপার্জনের খাতিরে বিবাহবিমুখ। এটা যুগধর্ম। সব দেশেই এক প্রবণতা। শূদ্র জাগরণের মতো নারী জাগরণও এই প্রবণতার মূলে। নারীর হাতে এখন এক মোক্ষম অস্ত্র এসে গেছে। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশল। মা হতে সে যদি আদৌ রাজী হয় তবে ওই একটি দুটির বেশী নয়। সেটা ভারত সরকারেরও পলিসি। চীন সরকার আরো এক কাঠি সরেশ। একবারের বেশী মা হতে দেবেন না। জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ভয়ে জাপান সরকার গর্ভপাতেরও ঢালা ব্যবস্থা করেছেন। জনসংখ্যা আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে আইনের জোরে স্টেরিলাইজ করাও অসম্ভব নয়। পৃথিবীর খাদ্য সঙ্কট ইতিমধ্যেই দুর্বিষহ। হস্তক্ষেপ না করলে তুঙ্গে উঠতে পারে। পরমাণু বোমা দিয়ে অর্ধেক সংখ্যা না কমালে নয়। নারী কেন এই আসুরিক সমাধানের নিমিত্ত হবে? পাশ্চাত্য দেশে এখন শান্তি আন্দোলনের স্তম্ভ অগ্রণী হয়ে সত্যাগ্রহ করছে।

ভারতের মতো একটি প্রাচীন সভ্য দেশ বধূদাহ সহ্য করছে কোন মুখে? পণ-যৌতুকের বিরুদ্ধে আইন পাশ করাই যথেষ্ট নয়। আইনকে ফাঁকি দেওয়া এতই সহজ যে তলে তলে লেন দেন চলবেই। স্বামীর চেয়ে শাশুড়ী শ্বশুরই বেশী অর্থ-পিশাচ। তাঁদের দিক্ থেকে ও বলবার আছে। ছেলের বিয়েতে মোটা টাকা না নিলে মেয়ের বিয়ে দেবেন কী করে? মেয়ের দায়িত্ব কি সরকার নিচ্ছেন? গোটা সমাজটাই যদি অর্থপাগল হয় তবে কে কাকে শিক্ষা দেবে? যুবকদের মধ্যে কি খুব একটা পৌরুষ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? যুবতীদের মধ্যে খুব একটা তেজ? সবাই রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। সমাজসংস্কারের জন্যে সময় দিচ্ছে কে? সেটা আরো ত্যাগ সাপেক্ষ। অবলাদেরই প্রবলা হতে হবে। সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। আত্মসংশোধন করতে হবে। বধূবধের অর্ধেক দোষ তো তাদেরই।